হৃদয় গলে সিরিজ-১৭

যে গল্পে মানুষ গড়ে

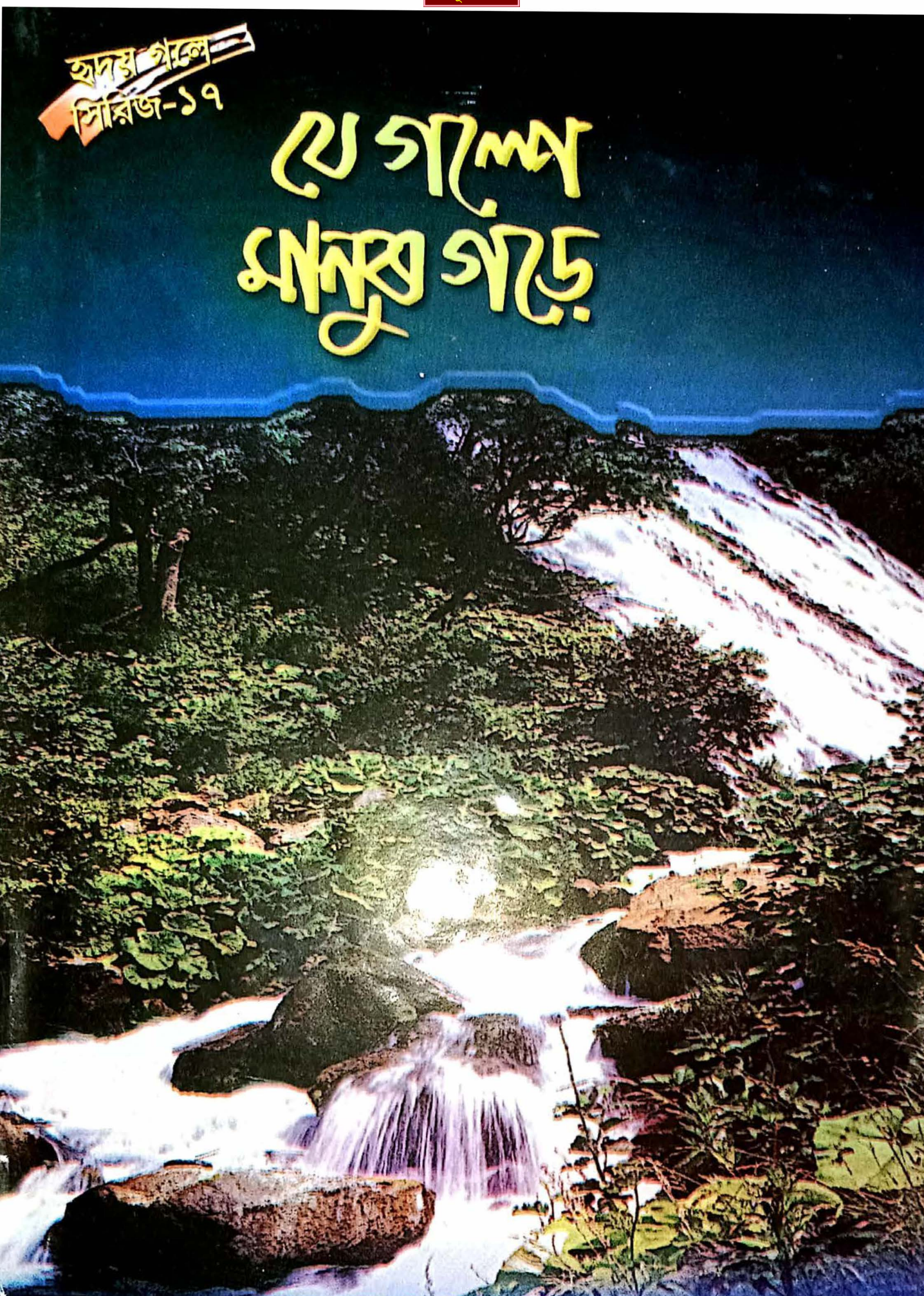

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

সূচীপত্র

সিরিজ-১৭

যে গল্পে মানুষ গড়ে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

সম্পাদনায়
মাওলানা আবুল কালাম মাসূম

প্রকাশনায়
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

সিরিজ-১৭
যে গল্পে মানুষ গড়ে
মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
মেবাইল : ০১৭১২-৭৯২১৯৩

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশকাল
জুলাই- ২০০৬ ইং
জুমাদাস সানী- ২৭ হিজরি

মুদ্রণে
ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন

মূল্য
একশত দশ টাকা মাত্র

www.smfoundationbd.com

যাঁর হস্ত মোবারকে ----------

হাজারো মানুষের প্রাণপ্রিয় মুরব্বী, গোটা বাংলার গর্ব, কীর্তিমান পুরুষ,
রঈসুল মুফাসসিরীন পীরে কামেল আল্লামা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা
সিরাজুল ইসলাম সাহেব (বড় হুজুর) দামাত বারাকাতুহুমের
দস্ত মোবারকে------যিনি অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে
হৃদয় গলে সিরিজের দু'খানা বই হাতে নিয়ে
পরপর তিনবার বলেছিলেন, হে আল্লাহ!
তুমি এ বইকে কবুল করো।
–লেখক

লেখকের সাথে যোগাযোগ

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদরাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী
মোবাইল-০১৭১২-৭৯২১৯৩, ০১৯২-৪৭২৮৯৯

www.smfoundationbd.com

পাঠক সমীপে দুটি কথা

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার, যার করুণাধারায় সিক্ত হয়ে হৃদয় গলে সিরিজ-১৭ যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে। দরূদ ও সালাম পেশ করছি, দোজাহানের বাদশাহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর।

সুপ্রিয় পাঠক! সিরিজ-১৬ এর ন্যায় সিরিজ-১৭ এর **"যে গল্পে মানুষ গড়ে"** নামটিও আপনাদেরই দেওয়া। টাঙ্গাইল থেকে বোন উম্মে মোস্তফা পাঠিয়েছেন এ নামটি। এজন্য তাকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ ও প্রাণঢালা অভিনন্দন। গত ৪ জুন ০৬ ইং কুইজ প্রতিযোগিতা-১ এর ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সত্যিই আমাকে দারুণ অনুপ্রাণিত করেছে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিজয়ীদের নাম ও ঠিকানা এ সিরিজে ছাপা হয়েছে। সেই সঙ্গে এতে পৃথক কাগজে সংযুক্ত রয়েছে **কুইজ প্রতিযোগিতা-৩** এর প্রশ্ন ও যাবতীয় নিয়মাবলি। আশা করি এতেও আপনারা সবাইকে নিয়ে অংশগ্রহণ করে সিরিজের অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করবেন। উল্লেখ্য যে, কুইজ-২ এর ড্র ১৬ আগষ্ট রোজ বুধবার অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস হিসেবে কেবল এ সিরিজেই পাঠকের মতামত বিভাগটি শুধু আপনাদের সুন্দর সুন্দর কবিতা দ্বারা সাজানো হয়েছে। যেসব কবিতা ভাল হয়েছে অথচ জায়গার অভাবে ছাপানো সম্ভব হয়নি, সেগুলো আল্লাহ চাহে তো পর্যায়ক্রমে আগামী সিরিজগুলোতে আসবে। তাছাড়া সামনের সিরিজে থাকছে পাঠক ফোরামের চূড়ান্ত রূপরেখা। আল্লাহ পাক হৃদয় গলে সিরিজের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এখলাসের সঙ্গে কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

দোয়ার মুহ্তাজ
মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
তারিখ-২৪-৬-২০০৬ইং

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	কনে দেখতে একদিন	৭
২.	মুহিনীর বিশ্বাস	২৩
৩.	প্রকৃত ভয়	৩২
৪.	সূরাতুল গিনা	৩৫
৫.	সহমর্মিতা	৩৭
৬.	উদার দান	৩৯
৭.	অগাধ বিশ্বাস	৪২
৮.	একটি ওয়াদার মূল্য	৪৬
৯.	ন্যায় বিচার	৪৮
১০.	সততা	৫২
১১.	কাঁদার ফল	৫৫
১২.	দানের এক অনুপম উদাহরণ	৫৭
১৩.	সত্যের জয় এভাবেই হয়	৫৮
১৪.	দুশমনের সন্তান	৬১
১৫.	মৃত্যুর পর কবরের খবর	৬৩
১৬.	অন্তিম ইচ্ছা	৭০
১৭.	গরিবের অপরাধ	৭৩
১৮.	পাঠকের মতামত	৭৯
১৯.	হৃদয় গলে সিরিজ কুইজ প্রতিযোগিতা–১-এর ফলাফল	৯৬
২০.	আরো যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে	৯৭

www.smfoundationbd.com

বনে দেখতে একদিন

গত কয়েক মাস আগের ঘটনা। বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ি গিয়েছিলাম। ব্যস্ততা ছিল প্রচুর। দম ফেলবার অবসর নেই। এরই মধ্যে এক লোক এসে হাজির। লোকটি আমার আত্মীয়। দূরের নয়, একেবারে কাছের। যাকে বলে নিকটাত্মীয়। এসেই মিনতিভরা আবদার- তোমাকে আগামীকাল এক জায়গায় যেতে হবে।

- কোথায় যেতে হবে? আমার পাল্টা প্রশ্ন।

- খুব বেশি দূরে নয়। এই তো শহরের এক জায়গায়।

- আমি তো ভীষণ ব্যস্ত। হাতে অনেক কাজ। দু' দিনের জন্য বাড়িতে এসেছি। এর মধ্যে কাজগুলো শেষ করতে পারব কি-না, সে চিন্তাই করছি।

- অতসব আমি বুঝি না। যেতে তোমাকে হবেই। আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, তুমি আসলে খুব ভাল হত। আল্লাহ আমার আশা পুরা করেছেন।

-- তা কাজটা কি একটু শুনি।

- কঠিন কোনো কাজ নয়। আমার ছেলের বিয়ের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছে। আগামীকাল কয়েকজন লোক মেয়ের বাড়ি দেখতে যাবে। জুমআর নামাজ শহরের মধ্যপাড়া মসজিদে পড়ার কথা। মসজিদের পাশেই মেয়েদের বাড়ি। মাত্র দু' মিনিটের পথ।

- লোকজন মেয়ের বাড়ি দেখতে যাবে, মেয়ে দেখবে না?

- সেটা কি আর বলতে হয়!

- আমি এসব কাজে খুব একটা যাই না। যাওয়ার সময়ও হয় না। তবে আপনি যখন এসেছেন, আপনার সম্মানার্থে শত কাজ থাকা সত্ত্বেও যাওয়ার এরাদা করছি। অবশ্য আমার একটা শর্ত আছে। সে শর্তটি পালন হওয়ার ব্যাপারে আপনার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা পেলেই আবেদন রক্ষা করা সম্ভব হবে, ইনশাআল্লাহ। অন্যথায় নয়।

- বলো, তোমার কী শর্ত আছে। তোমার যে কোনো শর্ত মানতে রাযি।

- শর্তটি হলো, সেখানে কোনো শরিয়ত বিরোধী কাজ হতে পারবে না। ছেলে কেবল একাই মেয়ে দেখবে। আমরা যারা এখান থেকে যাব, তাদের কেউ দেখতে পারবে না।

- ছেলের পিতা ও বন্ধু-বান্ধবরাও দেখতে পারবে না?!

- না, কেউ দেখতে পারবে না। যদি এই শর্ত মানতে রাযি থাকেন তবেই আমি যেতে প্রস্তুত আছি। অন্যথায় আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মাফ করবেন।

- ঠিক আছে। তোমার শর্ত অবশ্যই মানা হবে। তবে আমার একটি প্রশ্ন।

- করুন। নির্দ্বিধায়। নিঃসঙ্কোচে।

- আমার প্রশ্ন হলো, ছেলে একা দেখে কি মেয়ের ভাল মন্দ পুরোপুরি বুঝতে পারবে? যাচাই করতে পারবে তার জ্ঞানবুদ্ধি, গুণাবলী?

- ছেলের একা দেখা যথেষ্ট মনে না করলে প্রয়োজনে মহিলারা দেখতে পারে। তারা মেয়ের সাথে বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তা বলে তার বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি যাচাই করতে পারে। তাছাড়া মহিলাদের দেখায় কিছু বাড়তি ফায়দাও আছে। যা হাসিল করা পুরুষদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা মহিলারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়ে দেখতে পারে, বিভিন্ন ব্যাপারে প্রশ্ন করে এমন কিছু জেনে নিতে পারে যা পুরুষদের পক্ষে জানা বা দেখা কখনোই সম্ভব নয়।

- হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। কয়েকদিন আগে আমি নিজে মেয়ে দেখে এসেছি। অনেকক্ষণ তাদের বাড়িতে ছিলাম। মেয়ের কাজকর্ম, চলাফেরা, আচার-আচরণ ইত্যাদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। দৈহিক ও মানসিক অবস্থাও তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে ভুল করি নি। আমার বিশ্বাস, পুরুষরা তা কখনোই পারবে না। পারার কথাও নয়। যাক, তোমার যাওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হলাম। আমি এখনই গিয়ে পুরুষদের বলে দিচ্ছি, তারা যেন নিজেরা মেয়ে না দেখে।

পরদিন। যথাসময়ে উপস্থিত হলাম মেয়ের বাড়িতে। আমাদের লোকসংখ্যা আট দশজনের কম হবে না। প্রথমে আদর আপ্যায়ন চলল। মেয়ের বাপ এবং বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন তখন উপস্থিত ছিলেন। তাদের ব্যবহার ও আচার আচরণে বুঝা গেল, গভীর আন্তরিকতার সহিতই তারা আমাদের গ্রহণ করেছেন।

খাওয়া দাওয়ার পর আলাপ আলোচনা শুরু হলো। নতুন করে জানা হলো, মেয়ে সমন্ধে বহু তথ্য। সেই সঙ্গে জানা হলো, মেয়ের বাড়ির নানান বিষয়। এক কথায়, বিয়ের সময় সাধারণত যা জানার প্রয়োজন বোধ করা হয়, তার কোনোটাই আলোচনা থেকে বাদ যায়নি।

আলোচনায় আমিও যোগ দিয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, মেয়ে ও মেয়ে পরিবারের দীনদারীর পরিমান সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। খোদা তাআলার অপরিসীম ফজল ও করম যে, অল্প সময়ের মধ্যেই আমি আমার উদ্দেশ্য হাসিল করতে সমর্থ হয়েছি।

কথাবার্তা শেষ হলো। মেয়ে দেখানোর পালা এলো। মেয়ে কেবল ছেলেই দেখবে- এ তো আমার আগেরই কথা। শর্ত করেই এসেছি আমি। তবুও শরীয়তের বিধানটি আবার তাদের জানিয়ে দিলাম। স্মরণ করিয়ে দিলাম কয়েকবার।

আমার কথায় তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তবে আমাকে সবাই অত্যধিক স্নেহ করেন বলে মুখ খুলে আবার কিছু বলতেও পারছে না। ভাবখানা এমন, মেয়ের বাড়িতে এসে ছেলেই কেবল মেয়ে দেখে চলে যাবে, অন্য কেউ দেখবে না, এ কেমন কথা!

ফিসফিস করে গুঞ্জরণ শুরু হলো। দু' চার জন বাইরে গিয়ে পরামর্শ করল। সিদ্ধান্ত হলো, মেয়ে তারা সবাই মিলেই দেখবে। আর আমাকে দু' তিনজন মুরব্বীসহ অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেবে। মুরব্বীরা আমার সাথে কথাবার্তা বলবে। বাড়িঘর কেমন লাগল, এখানে আত্মীয়তা করা যায় কি না ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে সময় কাটাবে। আর এই ফাঁকে তারা নির্বিঘ্নে সমাধা করবে বউ দেখার কাজটি।

আমি সরল মানুষ। এতসব প্যাঁচপোচ বুঝি না। বুঝার চেষ্টাও করিনা। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমাকে অন্য রুমে সরিয়ে নেওয়া হলো। কথাবার্তা চলল অনেকক্ষণ ধরে। আর এই সুযোগে শুরু হলো বউ প্রদর্শনী।

কিছুক্ষণ পর মেয়েলি কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে চমকে উঠলাম। এরপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম সবকিছু। ব্যথায় চিনচিন করে উঠল বুকটা। ভাবলাম, হায়! আমাদের ঈমান-আমল কি এতই নিচে চলে গেল যে, শরয়ী বিধান জানানোর পরও তা মানার জন্য তৈরি হতে পারি না? মনের গহীনে কি একটু ভয়ও জাগে না যে, এর শাস্তি অবশ্যই একদিন ভোগ করতে হবে?

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আমার মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। ভীষণ কষ্ট পেলাম আমি। তবে কাউকে তা বুঝতে দিলাম না মোটেও।

একটু পর কারো ডাকে বাইরে গেলাম। আমাদের প্রায় সবাই জড়ো হয়েছে সেখানে। মেয়ে-পক্ষ থেকে কী বলে বিদায় নেওয়া যায়, এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল এটিই।

প্রত্যেকেই যার যার মত পেশ করছে। এমন সময় কেউ বলে উঠল, ছেলেকেও ডেকে তার মতামত জিজ্ঞেস করা হোক।

একজন চলে গেল ছেলে আনতে। এরপর অনেকক্ষণ অতিবাহিত হলো। কিন্তু ফিরে আসার কোনো নাম গন্ধ নেই। ছেলেকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এক সময় তাকে ঘরের অন্য একটি রুম থেকে বের হতে দেখা গেল। জিজ্ঞেস করা হলো, এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি?

ছেলে জবাব দিল, আপনারা চলে আসার পর আমাকে একটি মহিলা বলল, একটু ভেতরে আসুন। আমি ভেতরে গেলাম। দেখলাম, ঐখানে শুধু মেয়ে আর মেয়ে। বউ বসা ছিল একটি খাটের উপর। এমতাবস্থায় কি করব, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এমন সময় আরেকজন মহিলা এসে আমার হাত ধরে আমাকে একেবারে বউয়ের গা ঘেষেঁ বসাল। তারপর আমাকে এক গ্লাস দুধ খেতে দিয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না। একটু পরিচিত হতে ভিতরে নিয়ে এলাম। এই বলে তিনি এক এক করে উপস্থিত সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, ঐ সময় তো অন্যান্য লোকজন থাকার কারণে বউয়ের সাথে কথা বলতে পারেন নি, এবার প্রাণভরে কথা বলুন। আমরা গেলাম।

বউকে রেখে সত্যিই সবাই ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এমন একটা পরিস্থিতির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি। বড়ই অস্বস্তি লাগছিল আমার। তাই শেষমেষ কোনো কিছু না বুঝে লজ্জার মাথা খেয়ে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

ছেলের মুখ থেকে এসব কথা শুনে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। তাই সাথে সাথে নিয়ত করলাম, যদি আল্লাহ পাক তাওফীক দেন তবে পাত্রী দেখা প্রসঙ্গে কিছু জরুরি কথা লিখব। এতক্ষণ যা লিখেছি এবং সামনে যা লিখতে যাচ্ছি, এর সবকিছু মূলত ঐদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই।

মুহতারাম পাঠক-পাঠিকা! এখন আমি মূল কথা শুরু করার আগে ভূমিকা স্বরূপ দু চারটি কথা বলতে চাই। যাতে সামনের কথাগুলো আপনারা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের বিধানাবলি সহজ, সাবলীল, সুন্দর, উৎকৃষ্ট এবং কল্যাণকর। একথা ঠিক যে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ইসলাম মানুষকে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা বা তার মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনো সুযোগ দেয় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের বিধানাবলিকে সঠিক, সহজ ও সাবলীল অবস্থানে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। কঠিন ও জটিল করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন-

"নশ্চয়ই দীন সহজ। দীন পালনে যে কঠোরপন্থা অবলম্বন করবে, দীন তার জন্য সাধ্যাতীত হয়ে পড়বে। অতএব তোমরা সঠিক পথ অবলম্বন করো এবং সহজ পথে অগ্রসর হও।" (বুখারী১/১০)

কতিপয় সাহাবী যখন দীনকে কঠিনভাবে পালন করার ইচ্ছা করলেন এবং বললেন যে, আমি তাদের একজন বললেন যে, আমি সারা রাত ইবাদত করব, নিদ্রা যাব না। আরেকজন বললেন, আমি বিরতিহীনভাবে রোজা রাখব, কখনো রোজা ছাড়ব না। অন্যজন বললেন, আমি ঝামেলামুক্ত থেকে ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন থাকার জন্য বিয়েই করব না। তাদের এ পরিকল্পনার খবর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলে, তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন, জেনে রেখো, কসম খোদার-আমি তোমাদের চেয়ে বেশি পরহেজগার এবং আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি। কিন্তু আমি রোজা রাখি এবং ছেড়ে দেই। নামাজ পড়ি এবং নিদ্রা যাই। আবার বিয়ে-শাদীও করি। সুতরাং যে আমার নীতির বিরোধিতা করবে , সে আমার উম্মত নয়। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত১/২৭)

এভাবে নবী করীম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানাবলিকে তার সঠিক. সরল ও সাবলীল স্থানে রেখে পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। নিষেধ করেছেন কঠিন ও জটিল করতে। কিন্তু মাঝে মধ্যে আমাদের ভুলের কারণে. ইসলামী বিধানের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়ে থাকে।

আমরা কোনো কোনো ব্যাপারে ইসলামের সঠিক বিধানটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে সেখানে জটিল কিছু গ্রহণ করে বসি অথবা ইসলামী বিধানের সঠির প্রয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ না করে ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করে, ইসলামী বিধানের সৌন্দর্য ও সাবলীলতা নষ্ট করে ফেলি।

মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্ক। হাজারো রহস্যে ঘেরা এ এক কঠিন বিষয়। এ সম্পর্ক যেমন অনিবার্য তেমন জটিল। যেমন শান্তিদায়ক তেমন কষ্টদায়ক। যেমন কল্যাণকর তেমন অনিষ্টকর। বর্জন করার যেমন উপায় নেই, গ্রহণ করেও মুক্তি নেই। এ সম্পর্ক একটি সমস্যার সমাধান দিয়ে হাজারো সমস্যা সৃষ্টি করে। এর যে দিগন্তে উঁকি মারে শত-সহস্র আশা, সে দিগন্তেই লুকিয়ে থাকে রাশি-রাশি হতাশা। এ যেন দ্বিমুখী স্রোতের এক ভয়ঙ্কর মোহনা।

নারী-পুরুষের এ সম্পর্কের ইতিহাস যেমন সুন্দর, তেমন কুৎসিত। এই নির্মল, মায়াবী ও মনোমুগ্ধকর পৃথিবীকে আরো সুন্দর, আরো আলোকিত, আরো উজ্জ্বল করতে যত মহা-মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের আবির্ভাবের পিছনে রয়েছে নর-নারীর এ দাম্পত্য সম্পর্কের ভূমিকা। যাদের স্বচ্ছ, কোমল ও পুতঃ পবিত্র জীবন পাপড়ির কোমলতা এবং ফুলের সুবাসকেও হার মানায়।

পক্ষান্তরে যেসব মানুষের অসৎ চরিত্র, সুন্দর এ পৃথিবীর সবুজঘেরা বক্ষকে জুলুম-অত্যাচার, দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর খুন-খারাবী দিয়ে ভরে দিচ্ছে, কুলষিত করছে পুতঃ-পবিত্র পরিবেশকে, ভারাক্রান্ত করে তুলছে আকাশ বাতাস, সেসব চরিত্রের পিছনেও নর-নারীর এ সম্পর্কের পূর্ণ হাত রয়েছে।

একদল দুর্বল লোক প্রচণ্ড তৃষ্ণায় ছুটে গিয়ে যখন এ সম্পর্কের দ্বিমুখী স্রোতের ভয়াল মোহনায় হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন আরেক দল ভীত মানুষ তাদের এ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির করুণ পরিণতি দেখে বৈরাগী সেজে সন্নাসী বেশে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করেছে পর্বত চূড়ায়।

নিঃসন্দেহে উভয় দল সীমালংঘনকারী। কিন্তু সীমালংঘনকারী এ উভয় দলকে কেউ পারেনি পাহাড়ের চূড়া ও সমুদ্রের গর্ভ থেকে উদ্ধার করে সমতলে আনতে। কোনো তন্ত্র-মন্ত্র বা কোনো দর্শন মতবাদ পারেনি তাদেরকে সরল পথ দেখাতে। একমাত্র ইসলামই মানব জাতির অন্যান্য সমস্যার মত এ জটিল ও কঠিন সমস্যারও উত্তম ও অদ্বিতীয় সমাধান দিয়েছে। দেখিয়েছে এ ভয়াবহ পরিস্থিতির কঠিন ঘুরপাক থেকে মুক্তির কুসুমাস্তীর্ণ সরল পথ । যার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ও ইসলামী দর্শনের কিতাবাদিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

তবে সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলাম বিপদমুক্ত এ সরল পথ নির্মাণ করতে প্রথমে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা হলো– ইসলাম ব্যভিচারকে নিকৃষ্ট পথ বলে আখ্যায়িত করে উহাকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে। সাথে সাথে বন্ধ করে দিয়েছে ব্যভিচারের সকল পথ। যার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে পর-নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি। হারাম করা হয়েছে এই ঘৃণিত দৃষ্টিকে।

পক্ষান্তরে বিয়েকে পবিত্র পথ হিসেবে হালাল করেছে ইসলাম। এ পথের সকল জটিলতা দূর করে, এ পথকে সহজ, সরল ও সুগম করেছে। এ সহজিকরণের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখে পছন্দ করার অনুমতি প্রদান। বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্র-পাত্রী পরস্পরের প্রতি নির্বাচনী দৃষ্টি ফেলাকে ইসলাম শুধু বৈধ নয়, মুস্তাহাব ও পছন্দনীয় কাজ বলে অভিহিত করেছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান মুসলিম সমাজ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পাত্র-পাত্রী পরস্পর নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও সীমালংঘন করে চলছে।

একদিকে সাধারণ মানুষ পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো সীমা রেখাই রক্ষা করছে না। তারা পাত্র-পাত্রীকে ছেড়ে দিচ্ছেন তাদের ইচ্ছানুযায়ী ক্লাব, হোটেল, পার্ক, সমুদ্র সৈকত অথবা অন্য কোনো নিরিবিলি স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে একে অপরের সাথে পরিচিত হতে। কোথাও কোথাও বর তার দুলাভাই, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য লোকজনসহ কনে দেখতে যায়। এরপর কনে দেখে পছন্দ হলে এ পুরুষদের একজন কনের হাতে আংটি পরিয়ে দেয়। আল্লাহ মাফ করুন, কোনো কোনো জায়গা থেকে এমনও খবর পাওয়া যায় যে, বর-কনে বিবাহের পূর্বেই স্বামী-স্ত্রীর মত দেখাশুনা ও চলাফেরা করে। ফলে মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হচ্ছে ইসলামের এ সুন্দর বিধানটির সৌন্দর্য।

অপরদিকে কিছুসংখ্যক দীনদার ব্যক্তি পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখার সুযোগ দেয়াও শরীয়ত পরিপন্থি বলে মনে করছেন। ফলে এ সহজ ও সুন্দর বিধানটি রূপান্তরিত হচ্ছে এক কঠিন ও জটিল বিধানে। যা তাদেরকে এ বিধানের অন্তর্নিহিত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করছে।

প্রথম পক্ষ যা করছেন, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তা যে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য , তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুতঃ তারা নামে মুসলমান হলেও তাদের অন্তরে ঈমান কতটুকু আছে, তা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

আর দ্বিতীয় পক্ষ যে মত পোষণ করেন, তাও চুলচেরা বিশ্লেষণে টিকে না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– মুফতি কিফায়াতুল্লাহ সাহেব কর্তৃক লিখিত "শরীয়তের আলোকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন" বইখানা।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থি জাতিরূপে সৃষ্টি করেছি। (সূরা বাকারা–১৪৩)। সুতরাং পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ও পরস্পরকে দেখার ক্ষেত্রেও আমাদের জন্য এ মধ্যমপন্থা নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরি।

সুপ্রিয় পাঠক! ভূমিকাস্বরূপ দু চারটি কথা বলার পর এ পর্যায়ে আমি পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখে পছন্দ করার গুরুত্ব , পাত্রী দেখার নিয়মাবলী এবং আদর্শ পাত্র-পাত্রীর গুণাবলী সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি কথা বলতে চাই। আসুন আমরা ধৈর্য সহকারে কথাগুলো শুনি এবং আমল করার চেষ্টা করি।

ক) গুরুত্বঃ মানব জাতির জন্য বিবাহ আল্লাহ তাআলার বিশেষ নিয়ামতসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত। বিয়ে হচ্ছে নর-নারীর যৌন জীবন, সংসার জীবন ও বাস্তব জীবনের এক শৃঙ্খলিত ব্যবস্থা এবং অন্যদিকে আইনগত, ধর্মগত ও সামাজিক জীবনের এক সুদৃঢ় বন্ধন। এ বন্ধন একদিন দু দিনের নয়, সারা জীবনের।

বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যেমন উত্থান আনতে পারে, তেমনি পতনও ঘটাতে পারে। যেমন আনন্দ বয়ে আনতে পারে, তেমনি নিরানন্দের মহা সাগরেও ডুবাতে পারে। তাই এ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে অনেক কিছুই যাচাই-বাছাই ও বিবেচনা করা আবশ্যক।

বস্তুতঃ যে কল্যাণময় উদ্দেশ্যে বিবাহকে শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে, তার সফলতা নির্ভর করে দাম্পত্য-সম্প্রীতি, হৃদ্যতা ও সৌহার্দের উপর। তাই বিয়ের পূর্বে নর-নারীর পরস্পরকে জানা ও পছন্দ করার বিশেষ

গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ এ দিকটির প্রতি উদাসীনতা দাম্পত্য জীবনকে কলহপূর্ণ ও বিষাদময় করে তুলতে পারে। পরস্পরের মনে সৃষ্টি করতে পারে হতাশা ও যন্ত্রণার এক বিশাল কালো পাহাড়।

ইমাম আমাশ রাহ. বলেন, দেখা ব্যতিত বিয়ে সম্পন্ন হলে পরিণামে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার গ্লানি বহন করতে হয়।

দৃষ্টি মানুষের মনের প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে দু' জন নারী-পুরুষের চার চোখের মিলনে তাদের অন্তর প্রভাবিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর দর্শন পরস্পরের সম্প্রীতি ও বিয়ের স্থায়িত্বের জন্য খুবই তাৎপর্যময়।

খ) পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখার নিয়মাবলীঃ- ১. পাত্র শুধু পাত্রীর হাত, পা এবং মুখমণ্ডল দেখতে পারবে, এর বেশি নয়। তবে এসব অঙ্গের প্রতি সে বারবার দৃষ্টি দিতে পারবে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে থাকতে পারবে। কাপড়ের উপর দিয়ে মাথা হতে পা পর্যন্ত তার শরীরের উপর দিয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেরাতে পারবে, পরস্পর পাত্র-পাত্রী না হলে যা তাদের জন্য বৈধ হত না।

২. পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে স্পর্শ করতে পারবে না । কারণ, হাদীস শরীফে শুধু দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, স্পর্শ করার নয়।

৩. পাত্রীর অভিভাবক বা মাহরাম পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া কোনো নির্জন ঘর বা স্থানে পাত্র-পাত্রী একত্রিত হতে পারবে না। যাকে ফিক্‌হের ভাষায় খালওয়াত বলা হয়। কারণ খালওয়াত বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর জন্যও নিষিদ্ধ।

৪. পাত্রের সাথে পাত্রীর জন্য মাহরাম নয় এমন কেউ থাকতে পারবে না। শুধুমাত্র পাত্রই তাকে দেখবে।

৫. পাত্রের পিতা, ভাই , দুলাভাই বা অন্য কোনো পুরুষ আত্মীয়ের জন্য পাত্রী দেখা জায়েয নেই। যেমনটি আমি উপরিউক্ত ঘটনায় বর্ণনা করেছি।

৬. পাত্র-পাত্রী পরস্পর কথা বলতে পারবে। পরস্পরের সম্পর্কে জানতে পারবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে।

৭. পাত্র-পাত্রী উভয়ই স্বাভাবিক সাজসজ্জা করতে পারবে, যা শ্রী বর্ধনে সাহায্য করে। তবে এমন সাজসজ্জা করতে পারবে না, যাতে শরীরের

প্রকৃত রূপ ও আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায় এবং অপরপক্ষ প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, বয়স্ক হওয়ায় অথবা অন্য কোনো কারণে পাত্রের গোঁফ, দাড়ি, চুল পেকে গেছে; কিন্তু কালো কলপ বা খেজাব মেখে সে যুবক সেজে গেল। উদ্দেশ্য, যেন পাত্রী পক্ষ তাকে যুবক মনে করে। প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেলে পাত্রী বা পাত্রপক্ষ বিয়েতে রাজী হবে না। এ ধরণের সাজসজ্জা করা না জায়েয।

হযরত ওমর রাযি.এর কাছে এমন একটি ঘটনা পেশ করা হলে তিনি বিয়ে ভেঙ্গে দেন এবং পাত্রকে এই বলে শাস্তি দেন যে, তুমি ধোঁকা দিয়েছ।

তদ্রুপ পাত্রীও মেকআপ বা প্রসাধন সামগ্রী দ্বারা এমনভাবে সাজতে পারবে না যাতে পাত্রীর কালো ও শ্যামবর্ণের শরীর ফর্সা ও উজ্জ্বল দেখায়।

উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন পাত্রীর ঠোঁট কালো। সে এমনভাবে লিপস্টিক ব্যবহার করল, যাতে তার ঠোঁট যে কালো, পাত্র তা কোনোভাবেই বুঝতে পারল না। অথবা পাত্রী বেঁটে হওয়ার কারণে হাইহিল জুতো পরে শাড়ী ঝুলিয়ে পাত্রের সম্মুখে এমনভাবে আসল, যাতে পাত্র তাকে দীর্ঘদেহেনী মনে করে। এগুলো সবই ধোকার অন্তর্ভূক্ত। তাই এসব পন্থা অবলম্বন করা হারাম। একজন প্রকৃত মুমিন কখনোই এরূপ করতে পারে না।

বুযুর্গানে দীন ও আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ধোঁকার অন্তর্ভূক্ত হওয়ার আশঙ্কায়, নিজ মেয়ের শারীরিক ত্রুটি বিচ্যুতি এমন কি গোপন রোগের কথা পর্যন্ত পাত্রকে বিয়ের পূর্বে জানিয়ে দিতেন, যা মাতা-পিতা ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

তাছাড়া ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে বিবাহ কার্য সমাধা করলে, পরবর্তীতে দাম্পত্য জীবনে শান্তি আসে না। হয় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে নতুবা দু' পক্ষই আজীবন অশান্তিতে ভোগে। অথচ উভয় পক্ষ পরস্পরকে জেনে যদি বিবাহ করত, তাহলে এমন অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির শিকার হতে হত না। বরং সুখি হত তাদের জীবন।

৮. পাত্র কতৃক পাত্রী দেখার পালা তখনই আসবে যখন উভয়পক্ষ পরস্পরকে বিস্তারিত জেনে সবদিক দিয়ে পছন্দ হয়। অর্থাৎ এমন পর্যায়ে গিয়ে পাত্রী দেখতে হবে যখন উভয়পক্ষ একথা মনে করবে যে, আমাদের সবকিছু পছন্দ হয়েছে, এমনকি মৌখিক আলোচনা দ্বারা মেয়ের রূপ-গুণ সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তাও পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়েছে। এখন শুধুমাত্র

মুখের কথার সাথে বাস্তবতার মিল আছে কি-না, তা যাচাই করে মনের প্রশান্তি আনয়নের জন্যে পাত্রী দেখা হবে।

অনেক সময় দেখা যায়, আলোচনা শুরুই করা হয় মেয়ে দেখার পর। এরূপ করা মোটেও ঠিক নয়। কারণ এর দ্বারা মেয়ের অনেক ক্ষতি হয়। মানসিকভাবে মারাত্মক কষ্ট পায় সে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, মেয়ে দেখে পছন্দ হওয়ার পর ভিন্ন কোনো কারণেও বিবাহ না হলে অন্যরা এটাকে মেয়ের অযোগ্যতা হিসেবেই চিহ্নিত করে। তারা মনে করে, নিশ্চয়ই মেয়ের মধ্যে কোনো দোষ আছে, নচেৎ বিয়ে হলো না কেন? তাছাড়া একথা সবার কাছে বলে বেড়ানোও সম্ভব নয় যে, এই বিয়ে না হওয়ার পিছনে মেয়ের কোনো দোষ নেই, অন্য কারণে বিয়ে হয়নি। মোটকথা আগে মেয়ে দেখে পরে বিয়ে না হলে এর দ্বারা যেহেতু নির্দোষ মেয়ের উপরই সাধারণত দোষ চাপে, যা তার জন্য অবমাননাকর ও কষ্টের কারণ, তদুপরি পরবর্তিতে অন্যত্র বিবাহ হতেও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, তাই এই নিয়ম সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য।

৯. এভাবে নিয়মানুযায়ী পাত্রী দেখার পর বিয়ে না হলেও যেন পাত্রীর মনে আঘাত না লাগে সেজন্য উভয়পক্ষকে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। সৃষ্টি করতে হবে এমনি পরিবেশ । মেয়েকে বুঝাতে হবে, পাত্রপক্ষ তোমাকে পছন্দ না করলে বা এখানে বিয়ে না হলে তোমার কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই। হয়তো এর মধ্যেই তোমার কল্যাণ নিহিত আছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণ চান। তার কাছে আমাদের এই বলে দোয়া করা উচিত- হে আল্লাহ! আমাদের আত্মীয়তা যেন তাদের সাথে হয় যাদের দ্বারা উভয় পক্ষের মঙ্গলই কেবল হয়, অমঙ্গল না হয়।

১০. পাত্র পাত্রীকে বা পাত্রী পাত্রকে অপছন্দ করা অসম্ভব কিছুই নয়। এ ক্ষেত্রে এক পক্ষের মন রক্ষা করতে গিয়ে অপর পক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করা মোটেও সমীচীন নয়। এই চাপাচাপির পরিণতি উভয় পক্ষের জন্য ক্ষতিকর। বরং এক্ষেত্রে বাস্তবতাকে মেনে নেওয়াই উচিত হবে। এই বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত থাকতে পারে। অতএব এ ধরনের সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য উভয়পক্ষকে পূর্ব হতেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। তখন অনভিপ্রেত কিছু ঘটলেও তা মেনে নিতে কষ্ট হবে না।

১১. পাত্রীকে দেখার সময় পাত্র ইচ্ছা করলে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে পারে। তখন পাত্রীকে এর জবাব দেওয়া উচিত।

www.smfoundationbd.com

১২. পাত্রী দেখতে গিয়ে হাদিয়া দেওয়া জরুরী মনে করা অনুচিত। অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামাজিক প্রথার কারণে তা দেওয়া হয়ে থাকে। সামাজিক প্রথা পালনের উদ্দেশ্যে দিলে কোনো সাওয়াব হবে না। হ্যাঁ, কারো ভাল লাগলে পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত সুন্নত পালনের নিয়তে সাওয়াব প্রাপ্তির আশায় হাদিয়া দিতে পারে। কেউ হাদিয়া দিলে তা কবুল করা উচিত।

এ তো গেল পাত্রীকে সরাসরি দেখার কিছু নিয়ম। এখন কেউ যদি গোপনে পাত্রী দেখতে চায়, আর গোপনে দেখতে গিয়ে যদি মুখমণ্ডল ও হাত-পা ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ পাত্রের চোখে পড়ে যায়, তাহলে তার জন্য গোনাহ হবে না। যেহেতু গোপনে দেখতে গিয়ে এসব থেকে পুরোপুরি বেচেঁ থাকা সম্ভব হয় না। কারণ মহিলারা পর্দার ভিতর নিজেদের পরিবেশে এসব অঙ্গ সাধারণতঃ খোলাই রাখে। যে কারণে পাত্রের পক্ষে এসব অঙ্গ থেকে ভিন্ন করে শুধু মুখমণ্ডল ও হাত-পায়ের উপর নিজের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হবে না। -আল মুগনী, ৭/৪৫৪পৃষ্ঠা।

কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, যেন পাত্রী ছাড়া অন্য কোনো বেগানা মহিলার দিকে দৃষ্টি না পড়ে। কেননা প্রয়োজনবশতঃ শুধু পাত্রীকে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, অন্যকে নয়। কাজেই সীমা অতিক্রম করা যাবে না।

তবে যদি পাত্রীকে দেখার সময় কখনও বেগানা মহিলার উপর অনিচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি পড়ে যায়, তাহলে সাথে সাথেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি মাফ হলেও তা দীর্ঘায়িত করা বা পুনরায় বেগানা মহিলার প্রতি ইচ্ছাতকৃত দৃষ্টি ফেল বৈধ হবে না।

প্রিয় পাঠক! পাত্র-পাত্রী দেখার নিয়মাবলী বর্ণনার পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে তাদের গুণাবলী সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি ।

গ)আদর্শ পাত্রীর গুণাবলী ঃ দাম্পত্য জীবন সুখময়, শান্তিময়, সফল ও স্থায়ী হওয়ার জন্য স্ত্রীর মধ্যে আটটি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা-

১. দীনদার হওয়া:- স্ত্রী দীনদার বা ধার্মিক হওয়া আটটি গুণের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এ গুণটির প্রতিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ স্ত্রী ধর্মবিমুখ হলে নিজের সতিত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার ক্ষেত্রেও সে দুর্বল হবে। ফলে সে তার অপকর্ম দ্বারা স্বামীকে লোকসমাজে অপদস্থ, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে থাকবে। আর আত্মমর্যাদাবোধের কারণে স্বামীর অন্তর হয়ে উঠবে অস্থির, অশান্ত। তাছাড়া ধর্মবিমুখ স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে না বলে সে স্বামীর হক আদায়ে দারুণ অবহেলা করবে। স্বামীকে মানতে চাইবে না। কর্তৃত্ব করতে চাইবে স্বামীর উপর। কুণ্ঠাবোধ

করবে না স্বামীর মাল অপচয় করতে। তার ধারাল অশালীন কথা ও কাজকর্ম স্বামীর মনকে ভেঙ্গে চৌচির করে দিলেও সে উহার কোনোই পরওয়া করবে না। স্বামীর স্বার্থের চাইতে নিজের স্বার্থকেই বড় করে দেখবে। ফলে তাদের দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠবে কঠিন, সংকীর্ণ ও দুর্বিষহ।

আর যদি ধর্মীয় ত্রুটির পাশাপাশি স্ত্রী রূপসী ও সুন্দরী হয়, তাহলে বিপদ আরো কঠিন। কারণ স্বামীর পক্ষে তখন তাকে ত্যাগ করা কঠিন হতে পারে। ফলে স্বামী না তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে , না তাকে রেখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

এ জন্যই প্রিয় নবী সা. ধর্মের দিকটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে অন্যান্য গুণাবলীর উপর একে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- সাধারণত মেয়েদেরকে বিবাহ করা হয় তার সম্পদ, সৌন্দর্য, বংশগত মর্যাদা ও দীনদারীর জন্য। তবে তুমি অবশ্যই দীনদার রমণী বেছে নেবে। এতে তোমার মঙ্গল হবে। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত- ২৬৭ পৃষ্ঠা)

হযরত আনাস রা.থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা ইরশাদ করেন, কেউ যদি দীনদারী না দেখে কেবল পার্থিব ইজ্জত সম্মান দেখে কোনো মেয়েকে বিবাহ করে, তবে এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক অপমানিত করবেন। কেউ যদি কোনো মহিলাকে কেবল ধন-সম্পদের জন্য বিবাহ করে তবে ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক গরীব করে দেবেন। আর কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মেয়ের কেবল বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য ও বড়ত্ব দেখে বিবাহ করে , তবে আল্লাহ পাক তাকে অপদস্থ করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ সকল বিষয় উপেক্ষা করে কোনো নারীকে কেবল দ্বীনি কারণে এ নিয়তে বিবাহ করে যে, সে তার লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে, তার দৃষ্টিকে পরস্ত্রী থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং অটুট রাখবে আত্মীয়তার বন্ধন, তবে আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তিকে ঐ নারীর জন্য এবং ঐ পুরুষকে ঐ নারীর জন্য বরকত ও শান্তিদায়ক করবেন।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী। মেশকাত ২৬৭ পৃষ্ঠা।

২. আখলাক বা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়াঃ- স্বামী দৈহিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে দীনের উপর চলার জন্য, স্ত্রী উত্তম স্বভাব ও সুন্দর গুনাবলীর অধিকারী হওয়া অত্যন্ত জরুরী। কেননা স্ত্রী যদি বদ আখলাকী হয় এবং তার জবান থাকে অসংযত ও বেপরোয়া, সেই সাথে স্বামীর অনুগ্রহে হয় অকৃতজ্ঞ, তবে উপকারের তুলনায় তার ক্ষতির পরিমানই হবে বেশি।

স্ত্রীর অসংযত জবানের উপর ধৈর্য ধারণ করা এমনি এক কঠিন বিষয় যা দ্বারা অলীদের পরীক্ষা করা হয়।

৩. রূপসী হওয়াঃ- পাত্রী নির্বাচনে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে , রমণী রূপসী ও সুন্দরী হওয়া। কেননা পুরুষের চরিত্র রক্ষায় স্ত্রীর রূপ-লাবণ্যের অনেক ভূমিকা রয়েছে। কারণ অধিকাংশ মানুষের মন কুৎসিত ও অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা তৃপ্তি পায় না। তার উপর সন্তুষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য যে, যে হাদীসে দীনদারীকে প্রাধান্য দিতে এবং রূপ-লাবণ্যের জন্যে বিয়ে না করতে বলা হয়েছে, সে হাদীসের উদ্দেশ্য রূপ-লাবণ্য থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ করা এবং তার অবমূল্যায়ন করা নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, দীনদারী না থাকা সত্ত্বেও শুধু রূপ-লাবণ্যের জন্য বিয়ে করতে নিষেধ করা। কারণ অনেক সময় শুধু রূপ-লাবণ্যই মানুষকে বিয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং দীনদারীর বিষয়টিকে হালকা করে দেয়। পরিণামে স্ত্রীর কারণে স্বামীর দীনদারী বিনষ্ট হয়।

আর যদি দীনদারীর পাশাপাশি রূপ-লাবণ্যকে দেখা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। বরং এমন রূপ-লাবণ্য অধিক কল্যাণ বয়ে আনে। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন রূপ-লাবণ্যই কাম্য।

রূপ-লাবণ্যের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষ করে এমন ব্যক্তির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যে আপন স্ত্রীর উপর (যদি সে সুন্দরী না হয়) দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারবে না বলে আশঙ্কা করে।

আর যে ব্যক্তি বিবাহ দ্বারা শুধু সুন্নত পালন, সন্তান লাভ এবং বংশ রক্ষা করতে ইচ্ছা করবে, তার জন্য রূপের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাই উচিত। কারণ, ইহা তার যুহদ বা দুনিয়ার প্রতি অনিহা প্রকাশের একটি দিক। কেননা রূপ এক পর্যায়ে দুনিয়ারই অংশ; যদিও অনেকের ক্ষেত্রে তা দীনের সহায়ক হয়ে থাকে।

হযরত দারাণী রাহ. বলেন, প্রতিটি বস্তুতেই যুহদ আছে। এমনকি নারীর ক্ষেত্রেও। যেমন কেউ যুহদের প্রতি অনুরাগী হয়ে বয়স্কা মহিলা বিয়ে করল। এতে সে কেবল প্রয়োজন পুরা করল। পার্থিব চাকচিক্যের প্রতি লক্ষ্য করল না।

৪.মহর কম হওয়াঃ- মেয়েদের মহর কম হওয়াও একটি লক্ষণীয় বিষয়। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, সর্বোত্তম রমণী সে, যে রূপসী এবং তার মহর অল্প। তাখরীজে ইরাকী-২/৩৬

হযরত ওমর রাযি. মহরের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করতে নিষেধ করে বলেন, সমগ্র জাহানের সর্দার রাসূলুল্লাহ সা. চারশত দিরহামের অধিক মহরানা দিয়ে কোনো রমণীকে বিবাহ করেননি এবং নিজের কোনো কন্যার ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত মহরানা ধার্য করেননি। মহরানার মধ্যে অতিরিক্ত করা যদি সম্মান ও মর্যাদার বিষয় হত, তাহলে এর জন্য তিনিই ছিলেন সর্বাধিক উপযুক্ত এবং এ ব্যাপারে তিনিই সর্বাগ্রে থাকতেন নিশ্চয়ই।

৫. অধিক সন্তান প্রসবিনী হওয়াঃ- নবী করীম সা. বলেছেন, তোমরা প্রেমময়ী, অধিক সন্তানপ্রসবিনী নারী বিবাহ করো। (নাসাঈ, আবু দাউদ , মেশকাত-২৬৭ পৃষ্ঠা)। তাই পাত্রী যদি বিবাহিতা না হয় এবং তার বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কে কোনো কিছু না জানা যায়, সে ক্ষেত্রে সুস্থ ও যুবতী দেখে বিয়ে করা উত্তম। কেননা সুস্থ ও যুবতী নারীরাই সাধারণত অধিক সন্তান দান করে থাকে।

৬. কুমারী হওয়াঃ- পাত্রী নির্বাচনে রমণী কুমারী হওয়াও একটি লক্ষণীয় বিষয়। হযরত জাবের রাযি. বিধবা মহিলা বিয়ে করেছেন জানতে পেরে নবী করীম সা. তাকে বলেছিলেন, তুমি কুমারী বিয়ে করনি কেন? তাহলে তুমিও তার সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে, সেও তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত। (বুখারী, মুসলিম)

কুমারী রমণী এ যাবত যেহেতু কোনো স্বামীর সংশ্রবে আসেনি, তাই পূর্ব স্বামীর প্রতি আকর্ষণ দোষ তার নেই। বরং এই তার প্রথম স্বামী। এই তার প্রথম ভালবাসা। আর প্রথম ভালবাসাই গভীর থেকে গভীরতর হয়।

৭. ভাল বংশের হওয়াঃ-পাত্রী ভাল বংশের ও ধর্মীয় পরিবারের মেয়ে হওয়া চাই। কেননা খুব শীঘ্রই তার উপর আপন সন্তানদের লালন পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হবে। এ ক্ষেত্রে সে নিজেই যদি শিষ্টা, সুশীলা ও মার্জিতা না হয়, তাহলে সে সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা দিতে ব্যর্থ হবে।

৮. নিকটাত্মীয় না হওয়াঃ-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, পাত্রী নিকটাত্মীয় না হওয়া। তবে এ গুণটি লক্ষণীয় হলেও আবশ্যকীয় নয়। তাছাড়া এ গুণটি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন অনাত্মীয় পাত্রীর মাঝে উল্লেখিত গুণগুলো বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় গুণ দুটি বিদ্যমান থাকে। এ জন্যেই বলা হয়ে থাকে, যে অনাত্মীয়ের গুণাগুণ সম্পর্কে

ভাল করে জানা যায় নি, তার চেয়ে সে আত্মীয় ভাল, যার গুণাগুণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা রয়েছে। কারণ এ দীর্ঘ জীবনের সুখ উভয়ের সুন্দর গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল। তবে যদি অনাত্মীয়ের গুনাবলী সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগতি লাভ করা যায় এবং সে আত্মীয়ের গুণাবলীর সমপর্যায়ের বা তার চেয়ে ভাল হয়, তাহলে উল্লেখিত কারণে অনাত্মীয়কে প্রাধান্য দেওয়া ভাল।

ঘ)আদর্শ পাত্রের গুণাবলীঃ- পাত্রীর অভিভাবকের জন্য পাত্রের গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং আপন দুলালীর জন্য যোগ্যপাত্র নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি। কুশ্রী, দুশ্চরিত্র, ধর্মীয় বিষয়ে উদাসীন, স্ত্রীর হক আদায়ে অক্ষম– এমন পাত্রের সাথে কখনো মেয়ের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। বরং মেয়ে বিবাহ দিতে হবে এমন পাত্রের সাথে যার স্বভাব-চরিত্র ভাল, দেখায় সুন্দর, ধর্মের প্রতি অনুরাগী এবং স্ত্রীর হক আদায়েও সক্ষম।

পাত্রী নির্বাচনের চেয়ে পাত্র নির্বাচনে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা বিবাহ এমন এক বন্ধন বা এমন এক প্রকার দাসত্ব যা থেকে স্ত্রীর সহজে মুক্তির উপায় নেই। পক্ষান্তরে স্বামী সর্বদা-সর্বাবস্থায় তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

অতএব, যে ব্যক্তি নিজের অধিনস্থ কোনো মেয়েকে অত্যাচারী, পাপাচারী, বেদআতী ও মদ্যপায়ীর নিকট বিবাহ দিল, সে অন্যায় ও গুনাহের কাজে অংশ নিল, আত্মীয়তার হক নষ্ট করল, তদপুরি ক্ষমতার অপব্যবহার, দায়িত্বে অবহেলা এবং অধিনস্থ ব্যক্তির উপর জুলুম করে নিজেকে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত করল।

এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী রাহ. কে জিজ্ঞেস করল, হুজুর! আমার মেয়ের জন্য অনেক প্রস্তাব আসছে। আমি কোন্ পাত্রকে প্রাধান্য দিব এবং কার নিকট বিবাহ দিব?

জবাবে তিনি বললেন, এদের মধ্যে যে বেশি পরহেযগার, তার নিকট তোমার মেয়ের বিয়ে দাও। কারণ, স্বামী যদি তাকে পছন্দ করে তাহলে তাকে যথাযথ মর্যাদা দেবে। আর যদি অপছন্দ করে তাহলে অন্ততঃ তার উপর জুলুম-অত্যাচার করবে না।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে শরীয়তের সঠিক, সুন্দর ও কল্যাণকর পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী৫/৩২৮, তিরমিযি শরীফ ১/২০৭, এহইয়াউল উলূম, শরীয়তের আলোকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন-মুফতী কিফায়েতুল্লাহ)

২/২৩২

মুহিনীর বিশ্বাস

১৯৪৭ সাল। দু' ভাগে বিভক্ত হয় ভারতীয় উপমহাদেশ। একটির নাম পাকিস্তান, অপরটির নাম ভারত। ভাগ হবার পর মুসলমানরা পাকিস্তানে হিজরত করতে থাকে। হিন্দুরা জমা হতে থাকে ভারতে। বিভক্তির পূর্বে কিন্তু হিন্দু মুসলিম একত্রে বসবাস করত। পরস্পরের মধ্যে ছিল পিয়ার-মহব্বত। দেশ বিভাগের পর যেন উভয়ের মনও ভাগ হয়ে গেল। উঠে-পড়ে লেগে গেল নিজ নিজ এলাকা থেকে একে অপরকে বিতাড়িত করতে।

আমি এখন যে কাহিনী লিখতে বসেছি সে কাহিনীটি পাকিস্তানের সিন্দ এলাকার। সিন্দ একটি ছোট শহর। শহরেই বাস করত ছোট একটি হিন্দু পরিবার। পরিবারের সদস্য মাত্র দু' জন। স্বামী ও স্ত্রী। এখনো তাদের কোনো ছেলে মেয়ে হয়নি।

স্বামীর নাম নন্দলাল। স্ত্রীর নাম মুহিনী। তাদের প্রতিবেশি ছিল মুসলমান। দুটো পরিবারের মধ্যে ছিল পরস্পরে সীসাঢালা বন্ধন। কোথাও এতটুকু ফারাক নেই, নেই কোনো কালিমা। আমোদে- আহলাদে, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস ও বছরগুলো কাটছিল। কৃত্রিমতার এতটুকু ছাপ নেই কোথাও। নিরেট-খাঁটি আর নিখাদ ভালবাসার মাঝেই পরিবার দুটো পাশাপাশি বসবাস করছে। যেন একই পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেছে দুটো সন্তান। এভাবেই কেটে যায় তাদের বেশ কয়েকটি বছর।

প্রতিবেশি মুসলমান লোকটির নাম আহমদ। বয়সে নন্দলালের চেয়ে একটু বড়। নন্দলাল ও তার স্ত্রী তাকে ভাই বলেই সম্বোধন করত। সম্মান করত বড় ভাইয়ের মতই। কিন্তু আহমদ শেষ পর্যন্ত তার মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। দিতে পারেনি তাদেরকে ছোট ভাই ও বোনের মর্যাদা।

আসলে মানুষের মধ্যে দীনদারী না থাকলে, আল্লাহর ভয় অন্তরে পোখ্তা হয়ে না বসলে, যে কোনো মুহূর্তে সে বিপদগামী হতে পারে, লিপ্ত হয়ে যেতে পারে মহা অন্যায়ে, ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে বহু দিনের লালিত বিশ্বাস ও আস্থাকে। আহমদের বেলায়ও ব্যাপারটি তাই হয়েছে।

আহমদ নামে মুসলমান হলেও কাজে মুসলমান ছিল না। ছিল না তার মধ্যে মুসলমানিত্বের কোনো চিহ্ন। সে যেমন খোদার ভয়ে ভীত ছিল না, তেমনি পরওয়া করত না কোনো মানুষকেও। যখন যা ইচ্ছা তাই করত সে। তবে অন্যদের সাথে যাই করুক না কেন, নন্দলাল পরিবারের সাথে এখনো সে কোনো অসদাচরণ করেনি। সম্পাদন করেনি এমন কোনো কাজ, যদ্বারা তার উপর থেকে আস্থা উঠে যেতে পারে। নড়বড় হয়ে যেতে পারে বিশ্বাসের দেয়াল।

একদিন নন্দলাল প্রতিবেশী আহমদকে বলল, ভাই! বাধ্য হয়েই আমাদেরকে চলে যেতে হচ্ছে এখান থেকে। বুঝতেই তো পারছেন, এ দেশ, এ মাটি ছেড়ে চলে যেতে মন সায় দিচ্ছে না। এ মাটিতেই আমাদের জন্ম, এখানেই বড় হয়েছি আমরা। এ স্থান এখন ত্যাগই বা করি কিভাবে? কিন্তু কি করব বলুন। নিয়তির পরিহাস। পরিস্থিতি দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে। একদিন যে মুসলমানরা বিগড়ে গিয়ে আমাদের ক্ষতি সাধন করবে না- তারই গ্যারান্টি কি বলুন?

আহমদ বলল, নন্দ! কি আবোল তাবোল বকছ তুমি? আমরা বেঁচে থাকতে তোমাদের গায়ে ফুলের টোকা পড়বে, এটা তোমরা ভাবলে কেমন করে?

নন্দলালের মনে ভূত ঢুকেছে। তাই আহমদের কথায় সে আশ্বস্ত হতে পারে না। দিন দিন তাকে মনের ভয় গ্রাস করতে থাকে। পাকাপোক্ত করতে থাকে ভারতে যাবার সিদ্ধান্ত। মুহিনীকে বলে রাখে- তুমি তৈরি থেকো, যে কোনো দিন আমরা রওয়ানা হতে পারি ভারতের উদ্দেশ্যে।

এরপর অনেকদিন চলে যায়। হঠাৎ একদিন নন্দলালের নিকটাত্মীয় এক ভাইয়ের চিঠি আসে। চিঠিতে সে লিখেছে, আমরা ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাদের খবর কি? তোমরাও প্রস্তুত থাকলে বলো, এক সাথেই পাড়ি জমাই।

চিঠি পেয়ে নন্দলাল খুশি হয়। সে আহমদ ও তার স্ত্রীকে চিঠিটা দেখায়। জানতে চায় তাদের অভিমত।

আহমদ বলে, ঘরের আসবাবপত্র প্রস্তুত করে ফেল। তারপর তোমার ভাইয়ের কাছে গিয়ে সরাসরি আলাপ করে যাত্রার দিনক্ষণ ঠিক করে এসো।

প্রস্তাবটি নন্দলালের মন মতই হয়েছে। তাই স্ত্রী মুহিনীকে সবকিছু রেডি করতে বলে সকালে সে ভাইয়ের সাথে দেখা করতে রওয়ানা হয়।

নন্দলালের স্ত্রী ছিল অস্পরা সুন্দরী। একহারা গড়ন। লম্বা চিকন নাক। আপেলের মত গন্ডদ্বয়। কাজল টানা চোখ। ভ্রু দুটো ধনুকের মত বাকাঁ। জায়তুনি রং। দুধে আলতা মেশানো যেন। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স। ভরা যৌবন তার। বেতের ন্যায় টানটান শরীর। কেউ দেখে ভাবতেই পারবে না যে, তার বয়স ষোল-বছরের বেশি হয়েছে। মহান আল্লাহ আপন হস্তে যেন সৃষ্টি করেছেন এ মেয়েটিকে। সাক্ষাত হুর-বালা আর কি। তার দিকে দৃষ্টি পড়লে চোখ ফিরিয়ে নেয়, এমন সাধ্য ক' জনের আছে?

মুহিনী এখন একা। বাসায় আর কেউ নেই। নন্দলাল বলে গেছে সন্ধ্যার আগেই সে ফিরবে। এ সুযোগে আহমদের পশুত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সে অনেকদিন যাবত এ রমণীকে দেখে আসছে। কিন্তু কোনো দিন এতটুকুন ইঙ্গিত করতে সাহস হয়নি তার। না বলা কথাগুলো মনের মধ্যেই গুমড়ে মরছিল । হিম্মত হয়নি প্রেম নিবেদন করতে। সাহস হয়নি ভাল লাগার কথাগুলো জানাতে। সুযোগের সন্ধানে ছিল আহমদ। চাতক পাখির মত তাকিয়ে ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। এটাই তো মোক্ষম সময়। এ সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।

নন্দলাল চলে যাওয়ার ঘন্টা তিনেক পরেই আহমদ তার বাসায় এসে হাজির। সঙ্গে টাঙ্গা নিয়ে এসেছে। দস্তুর মত হাঁপাচ্ছিল ইবলিসটা। ভেতর থেকে নন্দলালের স্ত্রী মুহিনী জিজ্ঞেস করল, কে ভাই, কি কাজে এসেছেন?

জবাবে আহমদ বলল, ভাবী! তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। অলংকার, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী, নগদ অর্থসম্পদ সাথে নিতে ভুল হয় না যেন। শিগগির বের হও। নন্দলাল পাঁচটার গাড়িতে আসছে। তার সাথেই আসছে তোমার ভাইসহ সবাই। তারা একত্রে একই গাড়িতে চলে যাবে বলে খবর পাঠিয়েছে। এমুখো হবে না তারা। একটু পূর্বে তাদের পাঠানো এক লোক এ খবর দিয়ে গেছে। লোকটি এও বলেছে যে, আমার যত কাজই থাক না কেন, আমি যেন তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেই। তাই আমি সব কাজকর্ম ছেড়ে তোমাকে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে শেষ বিদায় জানাতে এসেছি।

নন্দলালের স্ত্রীর কাছে আহমদ অনেক দিনের চেনা মানুষ। তাই আহমদের কথায় সন্দেহ-সংশয়ের বিন্দুমাত্র উদ্রেক হয়নি তার মনে। তাছাড়া ভারত যাওয়ার কথা আলোচনা হচ্ছিল প্রতিদিন। মুহিনী ভাবল, সত্যিই তার স্বামী তাকে আহমদ ভাইয়ের সাথে যাওয়ার জন্য খবর দিয়েছে।

মুহিনী দ্রুত তৈরি হয়ে নেয়। অত্যধিক হিফাযতের জন্য স্বর্ণালংকার ও মূল্যবান জিনিষগুলো আহমদের হাতে সোপর্দ করে। তারপর বলে, ভাইজান! চলুন। আমি প্রস্তুত।

আহমদ মুহিনীকে টাঙ্গায় উঠায়। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখে। অতপর চালককে উদ্দেশ্য করে বলে, চলো ভাই।

মুহিনীদের বাড়ি থেকে স্টেশন বেশি দূরে ছিল না। অনেকক্ষণ ধরে টাঙ্গা চলছে। এতক্ষণে স্টেশন ছাড়িয়ে বহুদূর চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু টাঙ্গা থামছে না। অবিরাম গতিতে ছুটে চলছে। তাও আবার অন্য পথে। এতে মুহিনীর কিছুটা সন্দেহ হয়। সে আহমদকে লক্ষ্য করে বলে, ভাইজান! আমরা কোথায় যাচ্ছি? এটা তো স্টেশন রোড নয়।

ধূর্ত আহমদ জবাব দেয়, ভাবী! চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমরা জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে চলছি। তোমরা কখন, কোথায় চলে গেছ- একথা কেউই যেন টের না পায়, এ জন্যেই এ ব্যবস্থা।

আহমদের কথা শুনে মুহিনী চুপ হয়ে যায়। সে আর কথা বাড়ায় না। নিরবে ভগবানকে ডাকতে থাকে।

খানিক পর টাঙ্গা থেমে যায়। চারিদিকে গভীর অরণ্য। মুহিনী ভয়ে কাঁপতে থাকে। এরই মধ্যে ভেসে আসে পাপিষ্ঠ আহমদের গলার আওয়াজ- মুহিনী! প্রাণ আমার, নিচে নেমে এসো। আর কত সময় এভাবে টাঙ্গায় বসে থাকবে? ভূবন পাগল করা রূপ-যৌবন দিয়ে আমার হৃদয়-মনকে তুমি সিক্ত কর। সেই কবে থেকে তোমাকে কাছে পাওয়ার এক বুক তৃষ্ণা আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে।

আহমদের কথায় মুহিনীর হৃদপিন্ড থরথর করে কেঁপে উঠল। মুখমন্ডলে ফুটে উঠল একটা উৎকণ্ঠার ভাব। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরলো না। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে মনের সকল সাহস একত্রিত করে বলল, ভাই! আপনি কি লাজ শরমের মাথা খেয়েছেন? আমি তো আপনাকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছি। আপনিও আমাকে গ্রহণ করেছেন বোন হিসেবে। আমাদের সম্পর্ক এখন ভাই বোনের। মনে রাখবেন, জন্মের চাইতে ধর্মের মূল্য অনেক বেশি। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি আমাদের পবিত্র সম্পর্কের কথাটি একটু ভাবুন। লজ্জা-শরমের কথাটি একটু চিন্তা করুন।

সব অরণ্যে রোদন আর কি! আহমদের উপর তো আগেই শয়তান সাওয়ার হয়েছে। সে মুহিনীর কথায় মোটেও কর্ণপাত করেনি। বরং উল্টো তাকে নিজের দিকে টানতে থাকে। সেই সঙ্গে বলতে থাকে- রাণী আমার! পবিত্র সম্পর্ক তো পরেও দেখা যাবে। এ সম্পর্ক তো মূলতঃ প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন তুমি ক্ষত-বিক্ষত আমার এ তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে উপশম কর। এই নেশাসক্ত আঁখিযুগলে শরাব পান করিয়ে আমাকে শান্তি দাও। এ ধরণের সুযোগ খুব কম হয় মুহিনী। আমি চাই না এ সুযোগকে তুমি সম্পর্কের দোহাই দিয়ে পন্ড করে দাও। আমি চাই, এ সুযোগের সদ্ব্যবহার তুমিও কর, আমাকেও করতে দাও। উপকৃত তুমিও হও, আমাকেও কর। এসো, কাছে এসো। আরো কাছে এসো।

মুহিনীর মুখ এতক্ষণে মরার মুখের মত বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গুলির আঘাত খাওয়া পাখির ন্যায় ছটফট করছিল সে। করুণ চোখে তাকাচ্ছে মুহিনী আহমদের মুখের দিকে। তার দু' গন্ড বেয়ে ঝরে পড়ছে উত্তপ্ত অশ্রু।

আহমদ মুহিনীর দিকে তাকিয়ে হাসে। তাকে আবার টেনে নিতে চায়। মুহিনী ঝটপট পিছনে সরে যায়। সাহায্যের জন্য তাকায় টাঙ্গা চালকের দিকে। কিন্তু সেখান থেকে হতাশ হওয়া ছাড়া কিছুই পেল না সে। মনে হলো, সেও আহমদেরই প্রতিচ্ছবি। সেও কিছু ভাগ পেতে চায়।

চিৎকার দিতে চাইল মুহিনী। কিন্তু পারল না। ভয়ে কথা বের হচ্ছিল না তার মুখ দিয়ে। তবুও শেষ চেষ্টা হিসেবে উঠে দাড়ায় সে। দু' হাত জোড় করে বলে, ভাই! আল্লাহর দোহাই লাগে। আমার সর্বনাশ করবেন না। আমি আপনাকে আপনাদের প্রিয় নবীর দোহাই দিয়েও বলছি, আমার ইজ্জত কেড়ে নিবেন না। আমার যত টাকা পয়সা আছে, যত অলংকার ও মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী আছে, সব আপনি নিয়ে যান। এসব টাকা পয়সা ও অলংকারাদি দিয়ে আপনি আমার চেয়েও অধিক সুন্দরী রমণীর পাণি গ্রহণ করতে পারবেন। তাদের পাণি গ্রহণ করে আপনি আপনার জ্বলন্ত হৃদয়কে শান্ত করুন। তবুও একটু করুণা করুন আমার প্রতি। মুক্তি দিন আমাকে। সারা জীবন আমি আপনার এ করুণার কথা স্মরণ রাখব।

আহমদ বলল, এসব ধন-দৌলত তো আমারই। সেই সাথে তুমিও আমার। বুঝলে প্রিয়া! সোজা পথে রাগে না এলে বুঝতেই পারছ, আমাকে

বাধ্য হয়ে বক্র পথ বেছে নিতে হবে। এবার শেষ বারের মত বল, তোমার অভিপ্রায় কি।

মুহিনী নির্বাক। কোনো কথা সে বলে না । বলতে পারে না। মনে হয় যেন মাটির পুতুল দাঁড়িয়ে আছে।

আর দেরি সহ্য হচ্ছে না আহমদের। সে জাপটে ধরে মুহিনীকে। মিশিয়ে নেয় বুকের সাথে।

যবেহ করা পশুর মত তড়পাতে থাকে মেয়েটি। প্রাণপন চেষ্টা চালায় আহমদের বাহুবেষ্টন থেকে মুক্ত হতে। কিন্তু সব চেষ্টাই তার বৃথা যায়। পরাজিত হয় আহমদের পেশী শক্তির কাছে। আহমদ কোলে তুলে নেয় তাকে। রওয়ানা হয় পার্শ্বস্থ টিলার পিছনের দিকে।

বেচারী মুহিনী শত ফন্দি এটেও আহমদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। কি-ই বা করতে পারে সে। এক দুর্বল নারী, বলিষ্ঠ এক পুরুষের সাথে কিভাবেই বা কুলিয়ে উঠতে পারে। তাই শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে সে তার দাঁতগুলো সজোরে বসিয়ে দেয় আহমদের কাঁধের উপর। ব্যস, আর কি। মানবরূপী হায়েনাটি ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে। শিথিল হয়ে আসে তার বাহুবন্ধন।

এ সুযোগে মুহিনী তার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। আহমদের নাগালের বাইরে যাবার জন্য দৌড়াতে থাকে শরীরের সর্ব শক্তি একত্রিত করে।

আহমদ মিনিট দুয়েক স্বীয় কাঁধ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারপর শিকারী হাতছাড়া হয়ে যায় কিনা, সেজন্য মুহিনীর পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে পাগলের মত। ছুটতে ছুটতে এক সময় ধরেও ফেলে তাকে।

মুহিনী আবারো তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দোহাই দিয়ে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে মিনতি জানায়।

আহমদ জবাব দেয়, কোনো কাজই আল্লাহ এবং তার রাসূলের ইচ্ছা ব্যতিরেকে সংঘটিত হতে পারে না । এ সুবর্ণ সুযোগও আমি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতেই পেয়েছি।

মুহিনী হিংস্র লোকটির হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের অন্য কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। চিন্তা করছিল সে। হঠাৎ তার হাত গিয়ে পড়ে গলায়। হাতে চলে আসে একটি তাবিজ। সোনার মাদুলি দিয়ে বন্দী তাবিজটি। সে

তাবিজটি খুলে হাতে নেয়। আহমদকে লক্ষ্য করে বলতে থাকে, দেখো এ তাবিজের মধ্যে তোমাদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন মজিদের কটি আয়াত সংরক্ষিত আছে। এটা তো তোমাদেরই পবিত্র কুরআন। যা না-কি তোমাদের সংবিধান, মুক্তিসনদ। আমিও ভক্তির সঙ্গে গলায় রেখেছি কুরআনের আয়াতগুলো। আমি যদিও হিন্দু, তথাপি আমার বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ আমাকে এর বিনিময়ে, এর উসিলায় যাবতীয় বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবেন। লক্ষ্মী ভাইটি আমার! তুমি আমার ইজ্জত লুটে নিও না। আমার সতিত্বের উপর কালিমা লেপন করো না। সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদ তুমি এক ঝাপটায় ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলো না। দোহাই তোমার। এ আয়াতগুলোর সম্মানার্থে হলেও তুমি আমাকে পরিত্রাণ দাও।

আহমদ তাবিজটি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। অবজ্ঞা ভরে উহাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুহূর্তকাল দেখে নেয়। তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নিক্ষেপ করে দূরে, বহু দূরে। বলে, আয়াতের সম্মান সব সময়ই করা যাবে। এ মুহূর্তে এটা দূরে থাকাই ভাল। আর তোমার ভক্তি যদি কুরআনের উপর এত বেশিই হয়ে থাকে, তবে দেখা যাক, উহা তোমার কোনো উপকারে আসে কিনা।

এ বলে সে মুহিনীকে আবার জড়িয়ে ধরে। উম্মাদের ন্যায় ছিড়ঁতে থাকে দেহের বস্ত্রগুলো। এক পর্যায়ে মুহিনী বিবস্ত্র হয়ে যায়। অবশিষ্ট থাকে না তার দেহে এক ইঞ্চি কাপড়ও। জন্মদিনের পোষাক পরা মেয়েটি ভাবছে, জমিন কেনো ফেটে যায় না। এর চেয়ে জীবন্ত কবরই তো শ্রেয়। আল্লাহ কি এসব একেবারেই দেখছেন না?

আহমদ তার অপবিত্র বাসনা চরিতার্থ করতে মুহিনীর জীবনের গচ্ছিত সম্পদ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। মুহিনীও আয়াতের উসিলা দিয়ে ডাকতে থাকে আল্লাহকে। এভাবে অতিবাহিত হয় কয়েক মুহূর্ত। এরপর হঠাৎ এক গগনবিদারী চিৎকার বেরিয়ে আসে আহমদের কণ্ঠ চিরে। সাথে সাথে মুহিনীর গায়ের উপর ঢলে পড়ে তার বিশাল দেহ।

মুহিনী বিস্ময়ে হতবাক। কিভাবে কি হলো, প্রথমে সে বুঝতেই পারেনি। পরে দেখল, তিনফুট লম্বা একটা নিকষ কালো সাপ আহমদের পায়ের গোড়ালীতে কামড়ে ধরে রেখেছে। তার পায়ের গোছা বেয়ে অঝোরে ঝরছে কালো জামের রসের মত বিষাক্ত শোণিতধারা।

অল্প সময়ের মধ্যেই আহমদ তড়পাতে তড়পাতে শান্ত হয়ে যায়। মৃত্যুর সাথে সাথে সাপটি তাকে ছেড়ে দেয়। এঁকে বেঁকে চলে যায় । অদৃশ্য হয়ে যায় চোখের সামনে থেকে।

ভয়ঙ্কর এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিল টাঙ্গাওয়ালা। ছুটে আসে সে। যে তাবিজটি আহমদ ছুঁড়ে ফেলেছে, সেটি সন্তর্পণে তুলে নেয় । চুমু খায়। আঁখিযুগলে স্পর্শ করায়। শ্রদ্ধার আতিশয্যে গদগদ হয়ে পড়ে।

এরপর টাঙ্গাওয়ালা হুমড়ি খেয়ে পড়ে মুহিনীর পায়ে। বলতে থাকে, মুহিনী! আজ থেকে তুমি আমার বোন। তুমি তোমার পাপিষ্ঠ ভাইকে ক্ষমা কর। ক্ষমা কর আমাকেও। এতটুকু বলে সে কাঁদতে কাঁদতে স্বীয় পাগড়ীখানা মুহিনীর গায়ে জড়িয়ে দেয়। ঢেকে দেয় দেহের স্পর্শকাতর স্থানগুলো। তারপর যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে নিয়ে টাঙ্গায় উঠায়। চলতে থাকে বাসার দিকে।

টাঙ্গাওয়ালার নাম ছিল আবদুল্লাহ। পথিমধ্যে সে মুহিনীর কাছে তাবিজটির মাহাত্ম্য জানতে চায়। মুহিনী বলে-

দীর্ঘ সাত বছর ধরে আমার কোনো সন্তানাদি হচ্ছে না। সে জন্যে আমার এক মুসলমান সখি এ তাবিজটি আমাকে এনে দেয়। তাবিজের মধ্যে একটি হাতের চিহ্ন রয়েছে। সখি বলেছে, তাতে সূরা ইয়াসিন ছাড়াও লিখা রয়েছে তোমাদের পবিত্র কুরআনের আরো পাচঁটি আয়াত। আজ আমার বুঝে এসেছে, কুরআন কত মূল্যবান গ্রন্থ। কত অসীম শক্তি রয়েছে তাতে। কুরআনের বদৌলতে আল্লাহ আজ আমার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন। সত্যিই এটা অলৌকিক ঘটনা। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, বিশ্বের কোনো শক্তিই হিংস্র জানোয়ারটির হাত থেকে আমাকে বাচাঁতে পারবে না। কিন্তু যখনই সে কুরআনের সাথে বেয়াদবী করল, কুরআনের আয়াত সম্বলিত তাবিজখানাকে তাচ্ছিল্যের সাথে নিক্ষেপ করল অনেক দূরে; আমার মনে তখনই এ নিশ্চিত ধারণা জন্ম নিল যে, পাপিষ্ঠের উপর এখনই খোদায়ী গজব নেমে আসবে। নেমে আসবে কঠিন শাস্তি। ধ্বংস তার অনিবার্য। সত্যি কথা বলতে কি, এ চিন্তাটি আমার মাথায় আসার সাথে সাথেই আহমদের ভবলীলা সাঙ্গ হলো। বিদায় নিল সে এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরকালের মত। কথাগুলো বলতে বলতে তারা বাড়ি পৌঁছে যায়।

এদিকে পাচঁটার গাড়িতে নন্দলাল বাড়িতে পৌঁছে ঘরের মধ্যে সবকিছু খাঁ খাঁ করতে দেখে বিস্মিত হয়। এক অজানা আশংকায় তার অন্তর কেঁপে উঠে। পরে এদিক সেদিক খবর নিয়ে জানতে পারে, মুহিনী আহমদের সাথে টাঙ্গায় বেরিয়েছে।

নন্দলাল হিসাব মেলাতে পারে না। তার বুঝে আসে না যে, মুহিনী আহমদের সাথে কোথায় গেল? কেনই বা গেল? এসব ভাবতে ভাবতে আহমদের বাসায় পৌঁছে যায় সে। বাসা থেকে আহমদের স্ত্রী জানাল, আহমদ সেই যে সকালে বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি।

সীমাহীন দুশ্চিন্তায় ভুগতে থাকে নন্দলাল। খবর নিতে থাকে বিভিন্ন জায়গায়। জিজ্ঞেস করতে থাকে, পরিচিত অপরিচিত সবাইকে। কিন্তু সঠিক কোনো খবর কেউ দিতে পারে না। বলতে পারে না এরা কোথায় গেছে। এমন করতে করতে রাত গভীর হয়ে যায়। নন্দলালের দুশ্চিন্তা পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে।

দুশ্চিন্তার পাহাড় মাথায় নিয়ে নন্দলাল ঘরে বসে আছে। হঠাৎ মুহিনী ও আবদুল্লাহ ঘরে প্রবেশ করে। তারা নন্দলালকে ঘটনার আদ্যোপান্ত জানায়। কাহিনী শুনে নন্দলালও আর্শ্চযান্বিত হয়। হৃদয় জগতে বইতে থাকে এক নব পরিবর্তনের ছোঁয়া।

পরের দিন তাদের ভারত যাত্রার ইচ্ছা পাল্টে যায়। কুরআনের মুজিযা দেখে মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, কুরআনই একমাত্র আসমানী গ্রন্থ, যা মানুষকে মুক্তির দিশা দিতে পারে। পৌঁছে দিতে পারে পূর্ণ সফলতার দ্বারপ্রান্তে। সুতরাং দেরি না করে সেদিনই তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হয়। এগিয়ে চলে জান্নাতের পথ ধরে।

সন্তানের বড় সখ ছিল তাদের। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সে আশাও পূরণ হয়। আজ তারা চার-চারটি সন্তানের জনক-জননী। তারা আজ সুখের জীবন যাপন করছে। শান্তিই এখন তাদের জীবনের প্রধান সহচর। কোথাও নেই এতটুকুন কালিমা। নন্দলাল ও মুহিনী- মুহাম্মদ আলী ও আয়েশা নাম ধারণ করে পরম সুখে কাটিয়ে দিচ্ছে তাদের জীবনের বাকী সময়গুলো।

(সূত্র- আলোচ্য ঘটনাটি পাকিস্তানের লেখক জনাব তানভীর আহমদ খান এর লেখা থেকে অনূদিত।)

প্রকৃত ভয়

সুলতান মালিক শাহ। সেলজুক বংশের বিখ্যাত বাদশাহ। সদলবলে জঙ্গলে যাওয়া, বিভিন্ন জীব জন্তু শিকার করা খুবই পছন্দ করেন তিনি। এজন্য মাসে অন্তত একবার হলেও সখের এ কাজটি করতেই হয় তাঁকে।

বরাবরের মত একদিন তিনি জঙ্গলে রওয়ানা করলেন। সঙ্গে বিরাট সৈনিকদল। খুবই শান শওকতের সাথে কাফেলা এগিয়ে চলছে। উদ্দেশ্য ইস্পাহানের জঙ্গল।

বাদশাহ দু'চারজন সঙ্গীসহ সবার আগে। বাকীরা পিছনে। দ্রুতগামী ও হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়ায় আরোহনকারী বাদশাহ অনেকদূর এগিয়ে গেলেন। বেশ পিছনে রয়ে গেল অবশিষ্ট সৈন্যরা।

তখন দুপুর গড়িয়ে পড়েছে। পিছনের সৈন্যরা ক্ষিধের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ। সেই কাকডাকা ভোরে রওয়ানা হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কোনো দানাপানি পেটে পড়েনি। তাই দুর্বল এ দেহগুলোকে কিছুতেই সামনে এগিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না।

সৈন্যদের অনতিদূরে একটি সুন্দর গ্রাম। সামনে বিশাল মাঠ। বাদশাহ তাঁর কতিপয় সৈন্য নিয়ে অনেক আগেই এ মাঠ অতিক্রম করেছেন।

পিছনের সৈন্যরা সিদ্ধান্ত নিল, কিছুক্ষণের জন্য তারা মাঠে থামবে। সঙ্গে নিয়ে আসা খাবার খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করবে। যাতে সামনের পথটুকু দ্রুত চলা সম্ভব হয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঠে পৌঁছে সকলেই যাত্রা বিরতি করল। খাওয়া দাওয়া শুরুর পূর্বে তারা সেখানে একটি সুন্দর ও হৃষ্টপুষ্ট গাভী দেখতে পেল। গাভীটি এতই চমৎকার ছিল যে, সবাই এর প্রশংসা করতে লাগল। আশ্চর্য হয়ে বলল, কোনো গাভী কি এত সুন্দর হয়! এমন সুন্দর ও নযরকাড়া গাভী তো জীবনেও দেখিনি আমরা।

সৈন্যরা ছিল খুবই লোভী। তারা চিন্তা করল, গাভীটি দেখতে যেহেতু সুন্দর, খেতেও ভারী মজা হবে। তাই কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ তারা

গাভীটি ধরে নিয়ে এল। তারপর উহাকে জবাই করে গোশ্‌তগুলো আগুনে পুড়িয়ে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিল। এ সময় তারা একটুও চিন্তা করল না যে, এটি কার গাভী? কারো জিনিষ এভাবে খেয়ে ফেলা বৈধ হবে কি? আর চিন্তা করবেই বা কেন? তারা হয়তো ভেবেছে যে, আমরা বাদশাহের সৈনিক। কত ক্ষমতা আমাদের! এখানে কোনো অন্যায় অত্যাচার করলে কে যাবে বাদশাহের কাছে বিচার নিয়ে? আমাদের বিরুদ্ধে বাদশাহের কাছে অভিযোগ করবে এমন সাহস কার আছে?

গাভীর মালিক ছিল গ্রামের এক বুড়ি। গাভীটিই ছিল তার একমাত্র সম্বল। সে উহাকে অতি যত্নে লালন পালন করত। নিজের সন্তানের মতই উহাকে ভালবাসত। সে এবং তার ছোট্ট তিনটি ছেলেমেয়ের যাবতীয় ভরণ পোষণ গাভীর দুধ বিক্রি করার পয়সা দিয়েই চলত।

সৈন্যদের এ অমানবিক আচরণে বুড়ি খুব কষ্ট পেল। শোকে দুঃখে কাতর হয়ে গেল। কি করবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিল, বাদশার সৈনিকরা যখন তার গাভীটি জোর করে খেয়ে ফেলেছে তখন বাদশাহ রাজধানীতে ফিরার পথেই তার কাছে বিচার চাইবে।

বুড়ি বাদশার ফিরে আসার অপেক্ষায় রইল।

একদিন বুড়ি খবর পেল বাদশাহ শিকার শেষে রাজধানীতে ফিরছেন। যেহেতু গ্রামের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি চলে গেছে সেটি ছাড়া এখানে আর কোনো রাস্তা নেই, সুতরাং বাদশাহকে এ পথ ধরেই রাজধানীতে ফিরতে হবে।

বুড়ি ছিল খুব সাহসী। সে চিন্তা করে রাখল, পরে যা হবার হবে, কিন্তু আজ বাদশাহকে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য যা কিছু করা করা দরকার, দৃঢ় মনোবল নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে সবই সে করবে।

বুড়ি বাদশাহের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল।

বুড়ির এ কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হলো। সৈন্যরা তেড়ে এল। বলল, তোমার সাহস তো দেখছি কম নয়! এক্ষুণি লাগাম ছাড়, নইলে খতম করে ফেলব।

বাদশাহ সৈন্যদের বাধা দিলেন। বললেন, তোমরা বুড়িকে কিছু বলো না। সে কি বলতে চায় তা আমাকে শুনতে দাও। তারপর বুড়িকে সম্বোধন করে মমতা মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, বলো মা, কেন তুমি লাগাম ধরেছ? কী তোমার অভিযোগ?

www.smfoundationbd.com

বুড়ি বলল, আখেরাতে যদি পুলসিরাত পার হওয়ার ভয় থাকে, তবে এ পুল পার হওয়ার আগেই আমার একটি বিচার করতে হবে।

-পুলসিরাত পার হওয়ার ভয় আমার আছে। এখন বলো, তোমার কী বিচার করতে হবে। বাদশাহ বললেন।

-আপনার সৈনিকেরা গত কয়েকদিন পূর্বে এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় আমার আয় উপার্জনের একমাত্র সম্বল দুধাল গাভীটি জোরপূর্বক জবাই করে খেয়ে ফেলেছে। আমি এর উপযুক্ত বিচার চাই।

বুড়ির কথা শুনে বাদশাহের রাগ চরমে উঠে। তবে তা বুড়ির উপর নয়, সৈন্যদের উপর। তিনি দাঁতে দাঁত পিষে কঠিন কণ্ঠে বললেন, কী! আমার সৈনিকেরা তোমার গাভী জোর করে খেয়ে ফেলেছে? এত বড় সাহস এদের? আমি এদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব।

এরপর ঘোড়া থেকে নামলেন বাদশাহ। ডেকে জড়ো করলেন সকল সৈন্যকে। বললেন, বুড়ি তোমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে তা কি সত্য?

সৈন্যরা তাদের দোষ স্বীকার করল। বলল, জ্বী বাদশাহ মহোদয়, অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য। আমরা তার গাভীটি সুন্দর ও হৃষ্টপুষ্ট দেখে লোভ সংবরণ করতে পারিনি। তাই উহাকে ধরে এনে জবাই করে খেয়ে ফেলেছি।

অপরাধ স্বীকার করার পর বাদশাহ সৈন্যদেরকে এমন শাস্তি দিলেন এবং এমন কথা বললেন, যদ্বারা বুড়ি অত্যন্ত খুশি হলো। খুশি হলো উপস্থিত সকলেই। বাদশাহ বললেন, বুড়িমা! তুমি দুঃখ করো না। তোমার এ ক্ষতির জন্য আমি চরমভাবে লজ্জিত। আমি তোমাকে একটি গাভীর পরিবর্তে সত্তরটি গাভী দেওয়ার ওয়াদা করলাম।

অতঃপর রাজধানীতে ফিরে সত্যিই সত্যিই বাদশাহ বুড়ির নিকট সত্তরটি গাভী পাঠিয়ে দিলেন।

প্রিয় পাঠক! বাদশাহ মালিক শাহ্ যেমনিভাবে আখেরাতে পুলসিরাত নির্বিঘ্নে পার হওয়ার আশায় ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তেমনি আমরাও যদি আখেরাতের কথা মাথায় রেখে যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করি অর্থাৎ যে কোনো অন্যায় কাজ করার সময় আমরা যদি একটু ভেবে নেই যে, এ কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তবে নিশ্চয় আমাদের গোনাহের পরিমান কমে যাবে। সেই সঙ্গে বেড়ে যাবে সাওয়াবের পরিমানও। হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের তাওফীক দাও।

৪/২৩৪

সূরাতুল গিনা

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। তিনি হযরত উসমান রা. এর খেলাফত কাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ষাট বছর।

তিনি যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত, তখন একদিন হযরত উসমান রা. তাঁকে দেখতে যান। বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করেন- কি সমস্যায় ভুগছেন?

ইবনে মাসউদ রা. উত্তরে বলেন, পাপাচারের সমস্যায়। অর্থাৎ বর্তমানে আমি রোগের কারণে যে কষ্ট অনুভব করছি তা আমার পাপেরই ফল।

ঃ আপনার চাওয়ার কিছু আছে কি?

ঃ মহান আল্লাহর দয়া ও করুণা ছাড়া এ মুহূর্তে কিছুই চাওয়ার নেই আমার।

ঃ বহু বছর যাবত আপনি ভাতা নিচ্ছেন না। তা কি আবার পাঠিয়ে দেব?

ঃ আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

ঃ আপনার প্রয়োজন না হলেও আপনি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর আপনার মেয়েদের তা কাজে আসবে।

ঃ আপনি কি আমার মেয়েদের দারিদ্রতার ব্যাপারে ভীত হচ্ছেন? আমি তো তাদের নির্দেশ দিয়েছি, তার যেন প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়া তিলাওয়াত করে। কেননা আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া তিলাওয়াত করবে, দারিদ্রতা ও অভাব তাকে কখনো স্পর্শ করবে না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! বিভিন্ন হাদীসে সূরা ওয়াকেয়ার যথেষ্ট ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরায়ে ওয়াকেয়াকে সূরাতুল গিনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতঃপর

তিনি বলেছেন, তোমরা উহা নিজেও পড় এবং সন্তানদেরকেও শিক্ষা দাও। এক রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি সূরায়ে হাদীদ, সূরায়ে ওয়াকেয়া এবং সূরায়ে আর রাহমান পাঠ করবে, সে জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দা বলে অভিহিত হবে। আম্মাজান হযরত আয়েশা রা. থেকেও সূরা ওয়াকেয়া পাঠের ব্যাপারে জোর তাকীদ এসেছে। তবে মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত শুধু পার্থিব দু চার পয়সা লাভের আশায় সূরা ওয়াকেয়া বা অন্য কোনো আমল করা বড়ই হীনমন্যতার কথা । হাঁ, মানসিক সবলতা ও খোদা তাআলার রাযী খুশির নিয়তে পাঠ করলে দুনিয়া নিজে নিজেই হাত জোড় করে উপস্থিত হতে বাধ্য হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আজ থেকেই সূরা ওয়াকেয়ার নিয়মিত আমল শুরু করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

(সূত্র-তারাশে,ফাযায়েলেকুরআন।)

সাগর সেচা মানিক

মুসলিম বিশ্বের গর্ব, আরবী সাহিত্যের অগ্রদূত, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. বাংলাদেশী আলেমদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি আপনাদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ দেশের (বাংলা) ভাষাকে আপনারা অস্পৃশ্য মনে করবেন না। বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্য চর্চায় কোনো পূণ্য নেই, যত পূণ্য সবই আরবী আর উর্দুতে- এ ধরনের ধারণা বর্জন করুন। এটা এক মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়। বাংলা ভাষায় নিজেদেরকে এক বিরল প্রতিভারূপে গড়ে তুলুন। আপনাদের প্রত্যেককে হতে হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক, সাহিত্যিক ও বাগ্মি বক্তা। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় আপনাদের থাকতে হবে দৃপ্ত পদচারণা। লেখনী হতে হবে রসসিক্ত ও সম্মোহনী শক্তির অধিকারী, যেন আজ ধর্মবিমুখ শিক্ষিত তরুণ সমাজ অমুসলিম লেখক সাহিত্যিকদের লেখনী ছেড়ে আপনাদের সাহিত্যকর্ম নিয়েই মেতে উঠে, বিভোর হয়ে থাকে।

-তোহফায়ে মাশারিক

৫/২৩৫

সহমর্মিতা

জীর্ণ-শীর্ণকায় এক গোলাম। মুখমন্ডল ফ্যাকাশে বিবর্ণ। এমনিতেই রোগাক্রান্ত মনে হয়। তার উপর ক দিন যাবত বেশ অসুস্থ। একটু আগে মনিবের সাথে সাক্ষাত হয়েছে তার।

মনিবকে সে অসুস্থতার কথা জানিয়েছে। বলেছে, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু নিষ্ঠুর মনিব তার কথায় মোটেও কর্ণপাত করল না। সহানুভূতি দেখাল না বিন্দুমাত্রও। বরং উল্টো বলে গেল, আমি এতসব বুঝি না, আমি বুঝি কেবল কাজ আর কাজ। আজকের দিনের মধ্যে যেভাবে হোক এ আটাগুলো চূর্ণ করে দিতেই হবে। অন্যথায় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।

মনিবের কথায় গোলামের মুখমন্ডল মুহূর্তে কালো হয়ে উঠল। অসহায়ের মত তাকাল মনিবের মুখের দিকে। তার দুঃখ ও কষ্টের কথা কিভাবে সে মনিবকে আবারো বলবে, সে চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে তার গোটা মাথায়। কিন্তু এ সুযোগ আর মিলল না। বড় বড় পা ফেলে হনহন করে বেরিয়ে গেল মনিব।

গোলাম এখন নিরুপায়। মনিবের নির্মম নির্দেশে বাধ্য হয়ে সে আটা চূর্ণ করতে বসেছে। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর গোটা শরীর ঘামিয়ে উঠেছে। গলাটা কেমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হাত দুটো চলতে চাইছে না। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে। বারবার কেপেঁ উঠছে সমস্ত দেহ । মনে হচ্ছে এখনই সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

গোলামটি যখন শারীরিক কষ্টে কোঁকাচ্ছিল, তখন তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন দয়ার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার এ অবস্থা অবলোকন করে তিনি ভীষণ মর্মাহত হলেন। পানিভরা আকাশের মতই ছলছল করে উঠল তাঁর পবিত্র চোখ দুটো। তিনি এগিয়ে গেলেন। কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! কি হয়েছে তোমার? এমন করছ কেন? আমাকে বলো, দেখি তোমার কোনো উপকার করতে পারি কি না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় সে খানিকটা আস্বস্ত হলো। এত ব্যথা বেদনার মধ্যেও তার মুখমন্ডল এক স্বর্গীয় আভায় দীপ্ত হয়ে উঠল। ধীর কণ্ঠে সে বলল, আমি আজ কদিন যাবত অসুস্থ। সুস্থতার জন্য আমার মনিবের কাছে কিছুদিন ছুটি চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, এ শরীর নিয়ে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অনেক কাকুতি মিনতি করার পরেও মনিব আমাকে ছুটি দিতে রাযী হননি। এমনকি কাজ করার জন্য আমাকে কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সেই সাথে এও বলে গেছেন, যদি আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পরিমান কাজ করে শেষ করতে না পারি তবে নাকি আমার বিরাট বিপদ হবে। তাই আমি বাধ্য হয়ে এই অসুস্থ শরীর নিয়েই মনিবের দেওয়া এই আটা গুড়ো করার কাজ বিরামহীনভাবে করে যাচ্ছি।

গোলামের কথায় প্রিয় নবীজীর কোমল হৃদয় আবারো কেঁপে উঠে। সাগর সম কষ্ট এসে মুহূর্তে একত্রিত হয় তাঁর হৃদয়ের মনিকৌঠায়। তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। বেদনার এক পশলা নোনা পানি তাঁর মোবারক গন্ডদ্বয় বেয়ে টপটপ করে ঝরে পড়ে।

খানিক পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যথাতুর আঁখি দুটি বহু কষ্টে মেলে গোলামটিকে লক্ষ্য করে আনতস্বরে বললেন, ভাই! তুমি একটু শুয়ে আরাম কর। আমি তোমার কাজটা করে দিচ্ছি। এ বলে তিনি আটা চূর্ণ করতে বসে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুভাবে আটা চূর্ণ করার কাজ সম্পন্ন করলেন।

এবার বিদায়ের পালা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্বল গোলামের পাশে গিয়ে বসলেন। বললেন, ভাই! আটা গুড়ো করার কাজ আজকের মত শেষ হয়েছে। আবার যদি তোমার কোনো কাজে আমার প্রয়োজন অনুভব কর, তাহলে আমাকে একটু জানাবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে এসে তোমার কাজ করে দিয়ে যাব। এ কথা বলে তিনি বিদায় নিলেন।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমরা যদি নবী জীবনের এ টুকরো ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষের দুঃখ কষ্টে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি, প্রসারিত করতে পারি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত, তবেই আমাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আবারো প্রমানিত হবে, মানুষের জন্ম কেবল নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য নয়; মানুষ তো মানুষেরই জন্য। (সহায়তায়- নবী জীবনের টুকরো কথা)

৬/২৩৬
উদার দান

এক অসহায় ব্যক্তি। খুবই গরীব। স্ত্রী পুত্র নিয়ে বহু কষ্টে সংসার চলে তার। মাঝে মধ্যে সে না খেয়ে থাকে। তবু একান্ত ঠেকা না হলে মানুষের কাছে হাত পাতে না। গ্রহণ করে না ধার করজও।

একদিন লোকটি ভীষণ সমস্যায় পড়ল। এমন সমস্যায় কখনো সে পড়েনি। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমস্যার কথা জানিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে সে সাতশত টাকা কর্জ গ্রহণ করল।

লোকটি গরীব হলেও অত্যন্ত সৎ ছিল। জীবন দিয়ে হলেও সে ওয়াদা রক্ষা করার চেষ্টা করত। এ ব্যাপারে কখনোই সে অলসতা করত না।

করজদাতার কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পরিশোধের কথা উল্লেখ করে সে করয গ্রহণ করেছিল। বলেছিল, আমি যে কোনো উপায়ে নির্ধারিত সময়ে করজ পরিশোধ করবই ইনশাআল্লাহ।

সময় তার আপন গতিতে চলতে থাকে। একদিন দুদিন করে সময় বয়ে যায়। এভাবে খুবই নিকটে চলে আসে করজ পরিশোধ করার নির্দিষ্ট তারিখটি। কিন্তু এ পর্যন্ত সে অনেক চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারেনি। পারেনি একটি টাকাও সংগ্রহ করতে। আর পারবেই বা কি করে? তার উপার্জিত অর্থ দিয়ে তো সংসারের নূন্যতম প্রয়োজন মেটাতেই তাকে হিমশিম খেতে হয়েছে। এজন্য ভীষণ চিন্তায় পড়ে যায় সে।

অবশেষে কোনো উপায় না দেখে লোকটি বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ.-এর নিকট গেল। ঋণের ব্যাপারে সবকিছু খুলে বর্ণনা করে শেষ পর্যায়ে বলল, হযরত! এ ঋণ পরিশোধ করার মত ক্ষমতা আমার নেই। সুতরাং এখন আমি কি করতে পারি এ ব্যাপারে পরামর্শ দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. ছিলেন উদার মনের মানুষ। লোকটির এ অসহায়ত্বের কথা শুনে তার কোমল হৃদয় ব্যথায় ভারাক্রান্ত হলো। চোখ হতে টপটপ করে ঝরে পড়ল বেদনার নীল অশ্রুমালা। ভাবলেন তিনি, আমি স্বাচ্ছন্দের সাথে সুখে দিনাতিপাত করব, আর আমারই আরেক ভাই টাকার

অভাবে পেরেশানী উঠাবেন, কষ্ট ভোগ করবেন, এটা কখনো হতে পারে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজ কোষাগারের দায়িত্বশীল বরাবর সেই নিঃস্ব ব্যক্তির অবস্থার কথা উল্লেখ করে একটি পত্র লিখলেন। তারপর উহা লোকটির হাতে দিয়ে বললেন, এ চিঠিটা আমার কোষাগারের দায়িত্বশীলের কাছে নিয়ে যাও। আশা করি এতে তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হবে।

লোকটি চিঠি নিয়ে এগিয়ে চলল। মনে মনে ভাবতে লাগল, হযরত যখন আমার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সাতশত টাকার কম লিখেননি।

তখনকার দিনে সাতশত টাকা কোনো চাট্টিখানি কথা নয়। অকল্পনীয় এ অনুদানে লোকটি আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেল। এক টুকরা মধুর হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে। অধীর আগ্রহে সে হযরত ইবনে মুবারক রাহ.-এর কোষাগারের দায়িত্বশীলের কাছে গেল এবং তার হাতে চিঠিখানা দিয়েই আনন্দ গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগল, আমি সাতশত টাকা ঋণগ্রস্থ। করজদাতা দুদিন পর এসেই আমাকে টাকার জন্য চাপ দিবে। কিন্তু সে টাকা পরিশোধ করার মত সামর্থ আমার নেই। উপায় না দেখে আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ.কে বিষয়টি জানালাম। আল্লাহ তাআলা হযরতকে রহম করুন। তিনি আমার পুরো করজটাই আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছেন। আমার সাতশত টাকা করজ আদায়ের জন্য আপনার কাছে এ পত্র দিয়েছেন।

পত্রের বক্তব্যের সাথে লোকটির কথার মিল না হওয়ায় কোষাগারের ম্যানাজার তার দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন। বললেন, তোমার যিম্মায় কত টাকা করজ আছে? সে উত্তরে সাতশত টাকার কথাই বলল। সেই সঙ্গে আবারো বলল, পূর্ণ টাকা দেওয়ার আশা দিয়েই হযরত আমাকে আপনার কাছে পত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন।

ম্যানাজার আগেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছিল। এবার দ্বিধার পরিমান আরো বৃদ্ধি পেল। কেননা লোকটি বলছে সাতশত আর চিঠিতে লেখা আছে সাত হাজারের কথা। তাই সে লোকটিকে সম্বোধন করে বলল, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি হযরতের সাথে একটু আলাপ করে নেই। অপেক্ষার সমটুকু পার করার জন্য লোকটি পাশের রুমে গেল। সেখানে বসার সুন্দর জায়গা আছে। কিন্তু তার আর বসা হলো না। সে অস্থিরভাবে গোটা কক্ষে পায়চারি করতে লাগল। মুখমন্ডলে তার গভীর উদ্বিগ্নতা ফুটে উঠেছে। ভাবছে সে, তবে কি হযরত চিঠিতে টাকার পরিমান কিছু কম লিখেছেন? হয়তো বা তাই হবে। নইলে ম্যানাজার এমন করবেন কেন?

লোকটিকে অপেক্ষা করতে বলে ম্যানাজার সাথে সাথে কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন। লিখলেন, হযরত! সে ব্যক্তির তো সাতশত টাকা করজ। সাতশত টাকার কথাই সে বারবার বলছে। আর চিঠিতে লিখা আছে সাত হাজারের কথা। তাই এখন আমি কি করব বলে দিলে খুশি হব।

হযরত আবদুল্লাহ-ইবনে মুবারক রাহ. পত্র পাওয়া মাত্র বিলম্ব না করে ম্যানাজারের কাছে পুনরায় পত্র লিখলেন। বললেন, এখন তাকে চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়ে দাও।

ম্যানাজার কিছুটা বিস্মিত হয়ে আবার পত্র লিখল। তাতে লেখা ছিল, হুজুর! এভাবে অনুদান দিতে থাকলে তো অল্প সময়ে ধন ভান্ডার ফুরিয়ে যাবে। সামনে এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ভাল হবে।

ম্যানাজারের এ পত্র পেয়ে হযরত ইবনে মুবারক রাহ. গভীর মর্মপীড়া অনুভব করেন। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠে তার শুভ্র ললাটে। ভোরের শিশির বিন্দুর মতই চকচক করছিল সে ফোঁটাগুলো। তিনি আবার ম্যানাজারের কাছে এ কথা লিখে পত্র পাঠালেন যে, অনতিবিলম্বে তুমি তাকে চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়ে দাও। আমি তো দুনিয়াকে নিঃশেষ করে আখেরাত গোছানোর চিন্তাভাবনা করছি। তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই পবিত্র বাণী কখনো শোননি যে, তিনি ইরশাদ করেছেন-

কোনো মুসলমানের প্রয়োজনে যখন অপর কোনো মুসলমান ভাই তার আশাতীত সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে, তখন আল্লাহ পাক সাহায্যকারীকে ক্ষমা করে দেন। এবার তুমিই বলো, এই নিশ্চিত ক্ষমার ঘোষণার সাথে তুচ্ছ চৌদ্দ হাজার টাকার কি তুলনা হতে পারে?

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! শিক্ষণীয় এ ঘটনাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে সহজেই বুঝে আসবে যে, আমাদের পূর্বসুরি বুযুর্গগণ দুনিয়াকে কত তুচ্ছ নজরে দেখেছেন। অথচ আজ আমরা সামান্য এই দুনিয়ার পিছনে পড়ে আমাদের পরকালকে বরবাদ করে দিচ্ছি অবলীলায়। হালাল হারামের বাছ বিচার না করে টাকার পাহাড় গড়ে তুলছি । একবারও চিন্তা করে দেখছি না যে, এই টাকা আমার আখেরাতের জীবনে কতটুকু কাজে আসবে। হে আল্লাহ! আমাদের উপার্জিত টাকা পয়সা ও সহায় সম্পত্তি যেন আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহে সাহায্যকারী হয় সেরূপ ব্যবস্থা তুমি করে দাও। আমীন।

৭/২৩৭

অগাধ বিশ্বাস

আজ থেকে বহুকাল পূর্বের কথা। তখন ইরানের বাদশাহ ছিলেন শাহ আব্বাস। ন্যায়পরায়ণ ও সুশাসক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তার অভ্যাস ছিল আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর রা. এর মতই । তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ছদ্মবেশ ধারণ করে বেরিয়ে যেতেন এবং রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাধারণ প্রজাদের খোঁজ-খবর নিতেন।

একদিনের ঘটনা। বাদশাহ আব্বাস অনেক পথ হেঁটে শহর ছেড়ে শহরতলী এসে পৌঁছলেন। হঠাৎ তাঁর নযরে একটি কুড়েঁঘর পড়ল। সেদিন তিনি দরবেশের ছদ্মবেশে বেরিয়েছিলেন। এক পা দু পা করে কুড়েঁঘরের সামনে এসে তিনি ঘরের মালিকের কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ঘরের মালিক বেরিয়ে এসে তাঁকে সালাম দিলেন। তারপর অত্যন্ত তাজিমের সাথে ভিতরে নিয়ে একটি ছেঁড়া মাদুরে বসতে দিলেন।

বাদশাহ লোকটির সাথে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। কথার ফাঁকে লোকটি কোথায় কি করে জেনে নিলেন। সেই সঙ্গে এও বুঝে নিলেন যে, লোকটি গরিব হলেও বেশ মিশুক ও রসিকপ্রিয়।

লোকটি ছিল চর্মকার। সারাদিন জুতো সেলাই করে যা পায় তা দিয়েই সুন্দর করে সংসার চলে যায়। তার সাথে আলাপ করে বাদশাহ দারুণ খুশি হলেন। তদুপরি তার অতিথিপরায়নতা বাদশাহকে আরো মুগ্ধ করল। এক পর্যায়ে লোকটি জানাল, গোটা দিন সে যা রুজি করে ঐদিনই তা খরচ করে শেষ করে ফেলে।

বাদশাহ জানতে চাইলেন,আপনি তো দিনের আয় দিনেই শেষ করে ফেলেন। তবে কি পরদিন তথা ভবিষ্যতের জন্য কিছুই জমা করে রাখেন না?

লোকটি বললেন, না হুজুর। যা পাই তা এক সন্ধ্যাতেই খেয়ে সাবাড় করে ফেলি। কারণ আমি জানি, আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা। রিযিক দেওয়ার মালিক একমাত্র তিনিই। তার উপর আমার এ আস্থা আছে যে, তিনি আমাকে না খাইয়ে রাখবেন না।

আল্লাহর প্রতি লোকটির অবিচল আস্থা দেখে বাদশাহ যার পর নাই খুশি হলেন। তবে তার আস্থা কতটুকু মজবুত তা পরীক্ষা করার জন্য যাওয়ার সময় বলে গেলেন, আমি আগামীকাল আবার আসব।

পরদিনই বাদশাহ ফরমান জারী করে দিলেন যে, বাদশাহের অনুমতি ছাড়া কেউ জুতো সেলাই করতে পারবে না এবং ঐদিনই সন্ধ্যায় তিনি চর্মকারের বাড়িতে গিয়ে আবার হাজির হলেন। আজও তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, খাবার আর পানীয়ের কোনো অভাব নেই। গতকালের চাইতে আজকের আপ্যায়ন আরো ভাল হলো। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, আজকে রুজি-রোজগার কেমন হলো?

চর্মকার বললেন, রোজি -রোজগার ভালই হয়েছে হুজুর। সকালে কাজে গিয়ে শুনি, বাদশাহের অনুমতি ছাড়া জুতো সেলাই করা যাবে না। তখন কি আর করব বলুন। গেলাম কাপড়ের হাটে। কাপড়ের মোঠ বহন করে বেশ ভালই আয় হয়েছে হুজুর।

বাদশাহ বললেন, ধরো বাদশাহ যদি কুলির কাজ বন্ধ করে দেন, তাহলে কি করবে তুমি?

চর্মকার বললেন, কি করব জানি না। তবে রিজিকের মালিক আল্লাহ। তিনিই দেখবেন।

পরদিন সকালে বাদশাহ পুনরায় ফরমান জারী করলেন, বাদশাহের অনুমতি ছাড়া কেউ কুলির কাজ করতে পারবে না। এ ফরমান জারী করার পর সেদিন সন্ধ্যায় আবারো বাদশাহ ছদ্মবেশ ধারণ করে চর্মকারের কুড়েঁঘরে এসে হাজির হলেন। দেখলেন, এদিনও তার খাবারের কোনো অভাব হয়নি। তবু তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কেমন কাটল তোমার?

চর্মকার বললেন, কাজে বেরিয়ে শুনি, বাদশাহের অনুমতি ছাড়া কুলির কাজ করা যাবে না।

এ সংবাদ শুনে আমি একটু হাসলাম। মনে মনে বললাম, মহান আল্লাহর উপর যার আস্থা আছে, যার কাজ করার ইচ্ছা আছে, তার কি কাজের কোনো অভাব হয়? সত্যিই আমার কাজের অভাব হয়নি। একটু ঘোরাঘুরি করতেই লাকড়ি চিরার কাজ পেয়ে গেলাম। মজুরিও বেশ ভালো পেয়েছি।

বাদশাহ বললেন, আচ্ছা ধরো, আগামীকাল শুনলে, বাদশাহ লাকড়ি চিরার কাজও বন্ধ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় কি করবে তুমি?

চর্মকার দৃঢ় আস্থার সাথে বললেন, আল্লাহ যেভাবে চালান, সেভাবে চলব। এ নিয়ে চিন্তার কি আছে।

বাদশাহ আর কথা বাড়ালেন না। তিনি শেষ বারের মত পরীক্ষা নেওয়ার এরাদা করে বিদায় নিয়ে চলে এলেন।

পরদিন বাদশাহের ফরমান জারী হলো, বাদশাহের হুকুম ছাড়া কেউ লাকড়ি চিরার কাজ করতে পারবে না।

এদিকে চর্মকার যথাসময়ে কাজের উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু কোনো কাজ না পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাদশাহের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে একটু তদবীর করতেই রাজ-প্রহরীর চাকরীটা হয়ে গেল। তাকে দায়িত্ব পালনের জন্য একটি তরবারি দেওয়া হলো। সারাদিন কাজ শেষে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার পথে তিনি তরবারিখানা একটি দোকানে বিক্রি করে যা পেলেন, তাই দিয়ে খাবার কিনলেন। বাড়ি ফিরে একটি কাঠের তরবারি তৈরি করে তা খাপে রেখে দিলেন।

ঐদিন রাতে বাদশাহ পূর্বের ন্যায় তার ঘরে তাশরীফ আনলেন। প্রতিদিনের মতই তিনি বাদশাহকে ভাল খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। খাওয়া দাওয়ার পর বাদশাহ তার আয় রোজগারের খবর নিলেন। চর্মকার জানালেন, আজও আমার আয় রোজগার খারাপ হয়নি। সকালে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে কোনো কাজ না পেয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে বাদশাহের বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে চৌকিদারের দায়িত্ব পেয়ে গেলাম। সেই সাথে একখানা সুন্দর তরবারিও পেলাম। তবে দুখের বিষয় হলো, সারাদিন দায়িত্ব পালন করার পরও তারা আমাকে কোনো পয়সা দিল না। তাই তরবারি বিক্রি করে আজকের খাবারের যোগাড় করেছি। আর আগামীকালের দায়িত্ব পালনের জন্য একটি কাঠের তরবারি তৈরি করে তা খাপে ভরে রেখেছি এবং নিয়ত করেছি, বেতন পেলে ঐ টাকা দিয়ে সর্বপ্রথম রাজবাড়ি থেকে দেওয়া তরবারির ন্যায় একখানা তরবারি বানিয়ে নিব।

বাদশাহ বললেন, আগামীকাল যদি রাজ কর্মচারীরা তাদের দেওয়া তরবারি দেখতে চায়, তাহলে কি করবে তুমি?

তিনি বললেন, আল্লাহ ভরসা। তখন যা করার তিনিই করবেন।

পরদিন ভোরে চর্মকার বাদশাহের বাড়ি পাহারা দিতে গেলেন। তখন বাদশাহের শিখানো কথা অনুযায়ী কোতোয়াল তার হাতে এক কয়েদিকে তুলে দিয়ে বলল, একে অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে গর্দান উড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ভার তোমাকেই দেওয়া হয়েছে।

চর্মকার সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, মাফ করবেন হুজুর। আমি মানুষের গর্দান নিতে পারব না।

কোতোয়াল বললেন, তোমাকে পারতেই হবে। এটা স্বয়ং বাদশাহের নির্দেশ।

এবার চর্মকার বিপদে পড়লেন। তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করলেন। মনে মনে দোয়া করে বললেন, ওগো মাওলা! আমার হাতে কোনো মানুষ মারা সম্ভব নয়। তুমি আমাকে নিজ কুদরতে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

দোয়া শেষ হতে না হতেই আল্লাহ পাক তার মনে একটি সুন্দর কৌশল ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তরবারির খাপখানা উপরে তুলে ধরে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করে বলছি, যদি এই ব্যক্তি সত্যিই অপরাধী হয়ে থাকে, তবে এই খাপে ভরা তরবারি তার গর্দান নিবে। আর যদি সে অপরাধী না হয়, তবে আমার এই তরবারি কাঠের হয়ে যাবে। এ কথা বলেই তিনি তরবারি কোষমুক্ত করলেন। দেখা গেল, তার হাতে একখানা কাঠের তরবারি। এ দৃশ্য দেখে কোতোয়াল সবকিছু বুঝলেও উপস্থিত লোকজন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল।

এদিকে বাদশাহ খবর শোনার জন্য অধির অপেক্ষায় ছিলেন। কোতোয়াল যথাসময়ে সবকিছু বাদশাহকে খুলে বলল। এতে তিনি দারুণ খুশি হয়ে চর্মকারকে ডেকে পাঠালেন। চর্মকার রাজ দরবারে হাজির হলে নিজের পরিচয় দিয়ে বাদশাহ তার সাথে মোয়ানাকা করলেন। সেই সঙ্গে রাজ পরিষদের লোকদের কাছে আল্লাহর উপর তার অবিচল আস্থা ও উপস্থিত বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তারপর তাকে শাহী দরবারে একটি উচ্চপদ দিয়ে বরণ করে নিলেন। (সহায়তায়- সোনালী বিশ্বাস.পৃষ্ঠা-৩৪)

কুড়ানো মুক্তা

পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমি মনে করি যে, এর একমাত্র কারণ হচ্ছে সেখানকার উলামায়েকেরাম। কেননা তারা স্বজাতির ভাষার সাথে সম্পর্কিত নন।

-মুফতি মুহাম্মদ শফী রাহ.

৮/২৩৮

একটি ওয়াদার মূল্য

বদরের যুদ্ধ কিছুক্ষণ পর শুরু হবে। উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ঠিক এমন সময় দু জন সাহাবী ময়দানে এসে উপস্থিত হলেন। হৃদয় ভরা প্রত্যয় ও প্রত্যাশা নিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মক্কা থেকে এসেছি। পথিমধ্যে আমরা কাফেরদের হাতে বন্দি হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের এই শর্তে মুক্তি দেয় যে, আমরা যুদ্ধে আপনার পক্ষে যোগদান করব না।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাদের সাথে যে ওয়াদা দিয়েছি সেটা ছিল অপারগ অবস্থার ওয়াদা। এ ওয়াদা পালন করা আমাদের জন্য জরুরি নয়। আমরা অবশ্যই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করব।

প্রত্যয়ের শেষ প্রান্তে এসে তাঁরা দু জনই বুক টান করে দাড়ঁলেন। যুদ্ধে তাঁরা যাবেনই। ভীতি, দ্বিধা বা কোনো পিছুটান তাঁদের রুখতে পারবে না- এমন একটি অমলিন চেতনার সৌরভ তাদের কথোপকথনে ছড়িয়ে পড়ছিল। তারা নিশ্চিত ছিলেন, আল্লাহর রাসূল এ অবস্থায় তাঁদের হতাশ করবেন না, উল্টো যুদ্ধে যাওয়ার পথে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে তুলবেন। পথে কাফেরদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি, যুদ্ধে না জড়ানোর শর্তের মত মামুলি বিষয়টি এখানে পাত্তাই পাবে না। কিন্তু তাদের নিশ্চিত হওয়া বিষয়টিকে, তাদের প্রত্যাশা ও প্রত্যয়ের এই পাটাতনকে একদম গুড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন-

কিছুতেই না। তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর। যুদ্ধের ময়দান থেকে চলে যাও। আমরা মুসলমানদের কৃত অঙ্গীকার সর্বাবস্থায় পালন করব। আমাদের কেবল আল্লাহ তায়ালার সাহায্যই প্রয়োজন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠে কোনো রাগ ছিল না, ছিল না তার মুখে অপ্রসন্নতার কোনো ছাপ। ছিল না আচরণে নূন্যতম অসহিষ্ণুতার কোনো চিহ্ন। বরং মুসলমানদের ওয়াদার আকাশ সমান

মূল্যের ঘাটতি হতে না দেওয়ার একটি অপার্থিব দৃঢ়তার ধ্বনি ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখনিসৃত বাণী থেকে। মানবীয় প্রয়োজন কিংবা তীব্র প্রয়োজন শুধু নয়; আল্লাহর দীনের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামেও অঙ্গীকার ভঙ্গের কোনো পথ ধরে যেন কেউ বিপথে হেঁটে না যায় সেই ফরমান ঝরে পড়ছিল তাঁর আচরণ থেকে।

থমকে গেলেন দুই সাহাবী। মামুলি মূল্যবোধের ঘুণে ধরা ফ্রেম ভেঙ্গে তাঁদের হৃদয়ে উদয় হলো সমৃদ্ধ, প্রাচুর্যময় ও জীবনবাদী এক অমর মূল্যবোধের। অবাক হয়ে সাহাবীগণ দেখলেন, ঈমানদীপ্ত নীতির পাহাড়ে মানবীয় প্রয়োজনের ভঙ্গুর ডিঙ্গি এসে ধাক্কা দিতে পারে না।

প্রিয় পাঠক! বদর যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা যেখানে খুবই সামান্য, সেখানে দু জন সাহাবীর যুদ্ধে অংশ গ্রহণে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা অবশ্যই কিছুটা বৃদ্ধি পেত। কিন্তু ওয়াদা পালন সর্বাবস্থায় জরুরী– এ কথা কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতিকে শিক্ষা দানের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রাখলেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকেও তুমি রাসূলের আদর্শে আদর্শবান হয়ে ছোট বড় যে কোনো ধরণের অঙ্গিকার পালন করার তাওফীক দান কর। আমীন।

(সহায়তায়- সবুজ গম্বুজের ছায়া)

অমূল্য বাণী

আমাদের মতে মাদরাসা শিক্ষার সর্বাধিক ক্ষতি করেছে, মাতৃভাষা ও ইতিহাস শিক্ষার প্রতি অবহেলাই। মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা আলেম সমাজকে করেছে মুখ থাকা সত্ত্বেও মূর্খ, হাত থাকা সত্ত্বেও বকলমী এবং ইতিহাসের অবহেলা করেছে পার্থিব জগতের পরিবর্তিত অবস্থা ও চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ।

-মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী রাহ.

www.smfoundationbd.com

৯/২৩৯
ন্যায় বিচার

আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাতশ বছর আগের কথা। দিল্লীর শাহী তখ্‌তে তখন গিয়াস উদ্দিন বলবন। তিনি ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক। তাঁর শাসনকালে বাদায়ূনের শাসনকর্তা ছিলেন- মালিক ফয়েজ আহমদ শিরওয়ানী।

একদিন মালিক ফয়েজ অত্যধিক শরাব পান করে একেবারে বেসামাল হয়ে পড়লেন। হারিয়ে ফেললেন দিগ্বিদিক জ্ঞান। কখন কি করবেন, কোথায় কি করা করা উচিত- কিছুই খবর নেই তার। শুধু তাই নয়, একে মারা, ওকে ধরা—এই করতে করতে খানসামা অর্থাৎ খাবার পরিবেশনের জন্য নিয়োজিত একজন খাদেমকে পিটিয়ে মেরেই ফেললেন।

খানসামার ছিল এক যুবতী স্ত্রী। ফুলের মত ফুটফুটে একটি মেয়ে। বয়স আর কতই হবে। ষোল কি সতের। উচ্চতায় ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। গায়ের রং ফর্সা। রূপে-গুণে ও সৌন্দর্যে ছবির মত সুন্দর। প্রাণবন্ত হাসিতে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখত চারপাশ।

খানসামার মৃত্যুতে তার স্বল্প বয়সী স্ত্রী দারুণ মর্মাহত হলো। অবরুদ্ধ বেদনাকে চাপতে গিয়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মনে হলো, এ কান্নার যেন শেষ নেই। হৃদয় নিংড়ানো উচ্ছ্বসিত কান্না। প্রবল এবং তীব্র। যেন অনেক দিনের আটকে পড়া নদীর মুখ এইমাত্র খুলে দেওয়া হয়েছে।

অনেক কেঁদে কেটে খানসামার স্ত্রী এতসময় শান্ত হলো। ভাবল, আমি একজন খাদেমের স্ত্রী। এ জগতে কেউ নেই আমার। আমার মত সাধারণ একজন মেয়ের কথা কে-ই বা শুনবে। কে-ইবা করবে আমার স্বামী হত্যার সুষ্ঠু বিচার। অগত্যা সে মনের দুঃখ মনে চেপে দিন কাটাতে লাগল।

ওই ঘটনার কিছুদিন পর বাদায়ূন পরিদর্শনে এলেন সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন। সুলতানের আগমনে খানসামার স্ত্রীর অন্তরে স্বামী হারানোর বেদনা পুনরায় তাজা হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে জাগ্রত হলো ন্যায় বিচার প্রাপ্তির এক দৃঢ় আশাবাদ। তাই কোনো প্রকার ডর-ভয় না করে সে সরাসরি চলে গেল সুলতানের সামনে। এ সময় একটা জমাট ব্যথা যেন বেরিয়ে এল

তার বুক চিরে। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল, বিচার করুন আলমপনাহ্! ন্যায্য বিচার করুন। ইনসাফ করুন। আমি বড় দুখী, বড় একা।

মেয়েটির কথায় উদগ্রীব হলেন সুলতান। বললেন, কি হয়েছে খুলে বলো।

মেয়েটি মাথা তুলে ব্যাথতুর আঁখি দুটি বহু কষ্টে মেলে আনতস্বরে বলল, আপনার সুবাদার আমার নিরপরাধ স্বামীকে খুন করেছে। কতল করেছে বিনা কারণে।

বিনা কারণে কতল! বিস্মিত হলেন সুলতান।

বিধবা মেয়েটি বলল, জ্বি আলমপনাহ্, শরাব পান করে মাতাল অবস্থায় চাবুক মারতে মারতে তিনি মেরে ফেলেছেন আমার স্বামীকে।

স্তব্ধ নিঃশ্বাসে মেয়ের কথাগুলো শুনলেন সুলতান। ক্রোধে ও রোষে টগবগ করছিলেন তিনি। যেন চোখ দুটি ছিটকে বেরিয়ে পড়বে। কোষ থেকে তরবারি টেনে নিয়ে বাদায়ূনের এক রাজ কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটির কথা কি সত্যি?

জ্বি হযরত! কতকটা ইতস্তত ভাব নিয়ে বলল রাজ কর্মচারীটি।

সুবাদার মালিক ফয়েজকে এখনি আসতে বলো। এক প্রহরীকে হুকুম দিলেন সুলতান।

সুলতানের ফরমান নিয়ে প্রহরীটি চলে যাবার পর বিধবা মেয়েটিও পা তুলতে যাচ্ছিল। সুলতান অমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, দাঁড়াও ! তোমাকে সামনে রেখেই আমি বিচার করতে চাই।

সুলতানের রুদ্ররূপ দেখে কেপেঁ উঠল বিধবা। তারপর দরবারের এক পাশে গিয়ে ঠাই দাঁড়িয়ে রইল।

ফরমান পেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই সুবেদার ফয়েজ এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালেন। সুলতান প্রথমে তার দিকে অগ্নিঝরা দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর বিধবার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জন করে বললেন, এই অবলা মেয়েটি তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছে, তা কি সত্য?

-জ্বি হযরত! তবে------।

-তবে আবার কি?

-আমি---, মানে--, আমি তখন ঠিক --------।

-সজ্ঞানে ছিলে না, এই তো?

-জ্বি আলমপনা। ব্যাপারটা অনেকটা এমনই।

www.smfoundationbd.com

-তুমি কি জান না যে ইসলামে শরাব হারাম? তুমি কি এও জান না যে, ইসলামে শরাব কেন হারাম করা হয়েছে?

সুবাদার ফয়েজ কোনো জবাব দিতে পারলেন না। নিতান্ত অপরাধীর মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এবার সুলতান আপন মনে বলে উঠলেন, আসলে ক্ষমতা হাতে পেলে যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-নিষেধের পরওয়া করে না, যারা ক্ষমতার জোরে ইসলামী বিধি-বিধানগুলোকে দলিত মথিত করে - তারা কঠোর শাস্তির উপযুক্ত, এ পৃথিবীতে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা অনুচিত। তারা হামেশাই মনে করে- তারাই এ পৃথিবীর হর্তাকর্তা।

আফসোসের সঙ্গে কথাগুলো বলে গম্ভীর হলেন সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন। তারপর কিছুক্ষণ নিরব থেকে হঠা বলে উঠলেন, এই জল্লাদ কোথায়?

জল্লাদ কাছেই ছিল। সে দ্রুত সুলতানের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, জ্বী জাহাপনা। আমি হাজির আছি।

সুলতান কঠোর কণ্ঠে জল্লাদকে হুকুম দিলেন। বললেন, সুবাদারের মাথার তাজ খুলে নাও। খুলে নাও ওর শাহী পোষাক।

কাঁপা কাঁপা হাতে, নিতান্ত কলের পুতুলের মতই সুবাদারের দেহের পোষাক ও মাথার তাজ খুলে নিল জল্লাদ। নিতে বাধ্য হলো সে।

এবার মূল শাস্তির পালা। সুলতান জলদ্ গম্ভীর কণ্ঠে জল্লাদকে বললেন, কোড়া লাগাও। অব্যাহতভাবে লাগিয়ে যাও, এখনই, এই মজলিশেই।

যেই হুকুম সেই কাজ। সুলতানের নির্দেশ শেষ হতে না হতেই প্রকাশ্য মজলিশে সুবাদারের দেহে শুরু হয়ে গেল চাবুকের প্রচণ্ড আঘাত। সপা সপা -আঘাতের পর আঘাত। উপর্যপরি আঘাত। এভাবে অনেকক্ষণ আঘাতের পর এক সময় লুটিয়ে পড়লেন সুবাদার ফয়েজ।

জল্লাদের সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম ঝরছে। সুবাদার ফয়েজের গোটা দেহ রক্তাক্ত হচ্ছে। তবু বিরামহীনভাবে চলছে চাবুকের আঘাত। যেন এর শেষ নেই।

আরও কিছুক্ষণ চলার পর সুবাদারের দেহটা কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেল। নিরব হয়ে গেল চিরদিনের মত। এখন আর পূর্বের ন্যায় উহ্ আহ্ শব্দ হচ্ছে না। বেরিয়ে আসছে না তার মুখ থেকে করুণ আর্তনাদ।

সুলতানের দ্বিতীয় নির্দেশে থেমে গেল জল্লাদের চাবুক। একটু থেমে সুলতান ফের বললেন, নিয়ে যাও এর দেহটা। তোরণে লটকিয়ে রাখো।

লাশ সরিয়ে নেওয়ার পর সুলতান মহান আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন। বললেন, আয় আল্লাহ! আমি তোমার এক অতি নগণ্য বান্দা, আমি যা করেছি তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করেছি। নইলে শেষ বিচারের দিন তুমি আমার কাছে কৈফিয়ত চাইতে। তখন আমার জবাব দেওয়ার কিছুই থাকত না। আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি, বাকি তোমারই ইচ্ছা।

এই বলে সুলতান দু হাতে মুখ মুছলেন। অত পর খাজাঞ্চিকে হুকুম দিলেন, বিধবা মহিলাকে বিশ হাজার দিরহাম দিয়ে দেওয়ার জন্য। (সূত্র- সোনালী বিশ্বাস)

স্মরণীয় বাণী

বিপদে পড়লে আমি চার দফা আল্লাহর শোকর আদায় করি। প্রথমতঃ এজন্য যে, বিপদ হয়তো এর চেয়েও কঠিন হতে পারতো। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা সে বিপদ সহ্য করার মতো সৎ সাহস দিয়েছেন। তৃতীয়তঃ বিপদে পড়ে দোয়া ও ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধি হয়। চতুর্থতঃ বিপদ দুনিয়ার ব্যাপারে এসেছে দ্বীনের ব্যাপারে কোনো বিপদ আসেনি।

–ইবনে আরাবী (রহঃ)

যে অন্যের মুখাপেক্ষী হয় তার উপর তিনটি বিপদ আসে– ১. ধর্মের ব্যাপারে দূর্বলতা, ২. বিবেকের স্বল্পতা এবং ৩. আত্মমর্যাদার বিলুপ্তি।

–লোকমান হাকীম (রহঃ)

১০/২৪০

সততা

এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী। তার নাম ইউনুস ইবনে আবিদ। কাপড়ের ব্যবসা করতেন তিনি। তার দোকানে বিভিন্ন দামের কাপড় ছিল। তন্মধ্যে এক জোড়া কাপড়ের দাম ছিল দু শ টাকা, আরেক জোড়া কাপড়ের দাম চারশ টাকা।

কাপড়ের দোকানটি ছিল বেশ বড়। খুবই সুন্দর। তিনি ইসলামী বিধান মোতাবেক সততার সাথে ব্যবসা করতেন। ফলে অল্প দিনেই তার সুনাম সুখ্যাতি গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসার কাজকর্ম দিনদিন বৃদ্ধি পাওয়ায় গত কিছুদিন পূর্বে তিনি একজন কর্মচারী নিয়েছেন। কর্মচারীটি সম্পর্কে তার ভাতিজা হয়।

একদিন তিনি ভাতিজাকে দোকানে রেখে নামাজ পড়তে গেলেন। এমন সময় এক বিদেশী খরিদ্দার এসে চারশ টাকা মূল্যের এক জোড়া কাপড় দিতে বলল। কর্মচারী ছেলেটি দু শ টাকা মূল্যের কাপড় জোড়া বের করে দেখালে সেটিই তার পছন্দ হলো এবং কোনো কথাবার্তা না বলে অত্যন্ত খুশি মনে এ জোড়াই চারশ টাকায় নিয়ে গেল।

পথিমধ্যে ব্যবসায়ী ইউনুসের সাথে ঐ ক্রেতার সাক্ষাত হলো। ব্যবসায়ী নিজের দোকানের কাপড় দেখে জিজ্ঞেস করলেন-

-কত টাকা দিয়ে কিনেছেন?

-চারশ টাকায়।

-চারশ টাকায়?! ব্যবসায়ীর দু চোখে বিস্ময়।

-হ্যাঁ, চারশ টাকা দিয়েই খরিদ করেছি।

-এ জোড়ার মূল্য তো দু শ টাকার বেশি নয়।

-কেন? আমাদের দেশে তো এ জোড়া পাচঁশ টাকায় বিক্রি হয়।

- তা হতে পারে। কিন্তু আমি উহা দু শ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রি করি না।

- দোকানের কর্মচারীকে চারশ টাকা মূল্যের কাপড় জোড়া বের করতে বললে, সে আমাকে এ জোড়া কাপড়ই বের করে দেখাল। কাপড় পছন্দ হওয়ায় আনন্দচিত্তেই আমি চারশ টাকা দিয়ে উহা ক্রয় করে নিয়ে এসেছি।

ব্যবসায়ী ইউনুস আর কথা বাড়াল না। 'আপনি মেহেরবানী করে আমার সাথে দোকানে চলুন' এ বলে তিনি ক্রেতাকে নিয়ে পুনরায় দোকানে গেলেন। তারপর দু'শ টাকার দু'টি নোট ক্রেতার হাতে উঠিয়ে দিয়ে বললেন, জনাব! এ অনাকাঙ্ক্ষি ভুলের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আশা করি নিজ গুণে আমাদের ক্ষমা করে দিবেন।

ব্যবসায়ী ইউনুসের সুমধুর আচরণ ও তার গম্ভীর শান্ত মিষ্টি কণ্ঠস্বরে বিদেশী লোকটি মুগ্ধ হলো। সে মনে মনে চিন্তা করতে লাগল, আমি বিদেশী মানুষ। জীবনে আর কখনো হয়তো এখানে আসা হবে না। আমাকে পুনরায় এনে অতিরিক্ত মূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন তার ছিল না। কেননা এতে ব্যবসায়িক সুনাম ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা তার নাই বললেই চলে। আসলে লোকটির সততা ও সত্যবাদিতাই তাকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এসব কথা চিন্তা করতে করতে লোকটি দোকান থেকে বিদায় নিল।

ক্রেতা চলে যাওয়ার পর ব্যবসায়ী ইউনুস ভাতিজাকে ধমকের স্বরে বললেন, ভাতিজা! তোমার কি খোদার ভয় নেই? তোমার কি লজ্জা হলো না- একশ টাকায় একশ টাকা মুনাফা করতে? তুমি কি জান না, মানুষকে ধোকা দিলে, তাদের সাথে ইনসাফী আচরণ না করলে পরকালে খোদার দরবারে জবাবদিহি করতে হবে? মুসলমানদের মঙ্গল কামনা কি তোমার অন্তরে নেই?

ছেলেটি বলল, চাচাজান! তিনি নিজেই যেখানে খুশি হয়ে দিগুণ মূল্য দিয়ে কাপড় জোড়া নিয়ে যেতে রাযি হচ্ছেন, সেখানে আমি কেন সেধে সেধে মুনাফার পরিমান কমাতে যাব? এমন বোকামী দুনিয়াতে কেউ করে নাকি?

চাচা বললেন, হ্যাঁ করে। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে তারা করে। আর তোমার দৃষ্টিতে উহা বোকামী বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা মোটেও বোকামী নয়। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে কেবল মুনাফা অর্জনই মুমিন ব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়, বরং এর মাধ্যমে মানুষের খেদমত করে মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করাও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তুমি আজ যা করেছিলে এর দ্বারা প্রথম উদ্দেশ্য সফল হলেও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সফল হত না। অর্থাৎ মুনাফা অর্জন হলেও মানুষের খেদমত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হত না।

কারণ হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা নিজের জন্য যা পছন্দ কর , অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ কর।

এবার তুমিই বল, বিদেশী এ ক্রেতার কাছ থেকে তুমি যে পরিমান লাভ করলে, এরূপ লাভ অন্য কেউ তোমার থেকে করলে তুমি কি তা পছন্দ করতে? নিশ্চয়ই করতে না।

এ বিষয়টি এতক্ষণে ভাতিজার বুঝে আসল। সে বলতে লাগল, চাচাজান! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ভবিষ্যতে আর কখনোই এরূপ করবনা।

প্রিয় পাঠক! ভাতিজার সাথে সাথে আমরা ব্যবসায়িরাও যদি এ বিষয়টি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে আজ থেকেই পুরোপুরি আমল শুরু করে দেই, তবেই এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করা সর্বোতোভাবে সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক নসীব করুন। আমীন। (সূত্র- ইস্তিয়াব, পৃষ্ঠা-১৩৪)

স্মরণীয় বাণী

যখন আল্লাহ পাক কোনো বান্দাকে ধ্বংস করতে চান তখন তার মধ্যে তিনটি অবস্থার সৃষ্টি করেন– ১. তাকে ইল্‌ম দান করেন, কিন্তু তদানুযায়ী আমলের তাওফীক প্রদান করেন না। ২. নেককারদের সংস্পর্শে থাকার সুযোগ দান করেন, কিন্তু তাদের মর্যাদা অনুধাবন শক্তি এবং তাদের সম্মান অন্তর থেকে ছিনিয়ে নেন। ৩. নেক কাজ করার সুযোগ দেন, কিন্তু এখলাস থেকে বঞ্চিত রাখেন। আর ইহা বদ নিয়ত এবং আত্মার অপবিত্রতার ফলেই হয়ে থাকে। অন্যথায় যদি নিয়ত বিশুদ্ধ হয়, তাহলে ইলম থেকে ফায়দা এবং আমলের মধ্যে এখলাস ও বুযর্গের ও সম্মানের অনুধাবন অবশ্যই হবে।

–ইমাম আবুল লায়স সমরকন্দী (রহঃ)

১১/২৪১

কাদঁর ফল

হযরত আবু বকর রা.- এর খেলাফত কালের কথা। কুফায় যারাদ নামে এক লোক ছিল। সে সর্বদা অশ্লীল অপকর্ম করে বেড়াত। পাপিষ্ঠ এ লোকটি যেদিন মারা গেল ঘটনাক্রমে হযরত আবু বকর রা. সেদিন কুফায় উপস্থিত ছিলেন।

লোকটির মৃত্যু সংবাদ খলিফাকে জানানো হলে তিনি তার কাফন-দাফনে শরিক হলেন। দাফনের পর যখন কবর সমান করা হচ্ছিল, তখন তার মা খুবই কান্নাকাটি করছিল। সে কাদঁতে কাদঁতে হযরত আবু বকর রা. এর খেদমতে এসে তাঁর জামার আচঁল ধরে করুণ স্বরে বলল, হে আমীরুল মুমেনিন! মৃত্যুর পর আমি আমার ছেলের মুখ দেখেনি। দয়া করে শেষ বারের মত তার চেহারাটি আমাকে দেখিয়ে দিন।

বৃদ্ধা মহিলার এ করুণ আবেদন হযরত আবু বকর রা. উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি লোকদেরকে বললেন, মাটি সরিয়ে তাকে তার সন্তানের চেহারা দেখিয়ে দাও।

আল্লাহ তাআলার কী অপরিসীম কুদরত! কবরের মাটি সরানো মাত্রই দেখা গেল, মৃত ব্যক্তির নূরাণী চেহারার আলোতে গোটা কবর আলোকিত হয়ে গিয়েছে। এ দৃশ্য অবলোকন করে হযরত আবু বকর রা. সীমাহীন বিস্মিত হলেন এবং উপস্থিত লোকদের কাছে মৃত ব্যক্তির আমল-আখলাক ও দীনদারী সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

লোকেরা বলল, হুযুর! এ অত্যন্ত পাপাচারী ও বদ আখলাকী লোক ছিল। এমন কোনো অন্যায় কাজ নেই যে, সে করেনি। আমরা কখনোই তাকে ভাল কাজ করতে দেখিনি। নূরাণী চেহারা লাভ করার মত কোনো আমল করেছে বলে আমাদের জানা নেই।

লোকদের কথায় হযরত আবু বকর রা. কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। বুঝতে পারলেন না, এমন পাপিষ্ঠ লোকের চেহারা এত সুন্দর হলো কি করে।

যা হোক, দাফনের বাকী কাজ সমাপ্ত করে তিনি চলে এলেন। অতঃপর

রাতে যখন ঘুমালেন, তখন তিনি স্বপ্নে দেখলেন– সেই মৃত লোকটি অত্যন্ত সুন্দর পোষাক পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে উপবিষ্ট।

নবী করীম সা. হযরত আবু বকর রা. কে বললেন, গতকাল তুমি এ লোকটিকে কবর দেওয়ার সময় তার চেহারা খুবই উজ্জ্বল দেখেছিলে, তাই না?

জবাবে হযরত আবু বকর রা. বললেন, জ্বী হ্যাঁ।

নবী করীম সা. বললেন, এ লোকটি বড়ই গোনাহগার ও পাপী ছিল। কিন্তু গোনাহ করার পর খোদার ভয়ে সে খুব কান্নাকাটি করত। কাদঁতে কাদঁতে তার দু চোখ পানিতে ভিজে যেত। এই ভয় ও কান্নার কারণে আল্লাহ পাক তার জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন এবং তাকে এই বুলন্দ মর্তবার অধিকারী বানিয়েছেন।

মাওলানা রূমী রাহ. বলেন- বল, বিপদ থেকে কে রক্ষা পেতে চাও? তাহলে আল্লাহর সমীপে অশ্রু ঝরাও। কাদোঁ, কাদঁতে থাকো। কেননা কাদাঁর পরিণাম হলো, আনন্দ। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে চোখ খুবই ভাগ্যবান। আর যে প্রাণ তাঁর ভালবাসার প্রেমে দগ্ধিভূত হয় তার কতই না খোশ নসীব! প্রত্যেক কান্নার পরেই রয়েছে সুখ। ভাগ্যবান তো সেই যে পরকালের কথা ভাবে এই পার্থিব জীবনে।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাঁর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। (সূত্র-জামেউল হেকায়াত)

অমূল্য বাণী

চট্টগ্রামে অসংখ্য মনিমুক্তা অর্থাৎ বড় বড় আলেম রয়েছেন। কিন্তু স্বজাতির ভাষার সাথে সম্পর্ক না থাকার দরুণ সবই মাটি হয়ে গেল।

-মুজাহিদে আজম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ.

১২/২৪২

দানের এক অনুপম উদাহরণ

একদা এক ব্যক্তি হযরত হাসান রাযি. এর খেদমতে হাজির হলো। বলল, হে রাসূলের দৌহিত্র! আমি একটি বিশাল সমস্যায় নিপতিত হয়ে আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। দয়া করে আমার সমস্যার কথাটি শুনুন। তারপর যা করার করুন।

এ বলে লোকটি দীর্ঘ সময় নিয়ে নিজের অসুবিধার কথাটি খুলে বলল। হযরত হাসান রাযি. মনোযোগ সহকারে তার কথাগুলো শুনলেন। তারপর বললেন, তোমার চাওয়ার কারণে আমার উপর যে পরিমান সাহায্য করা জরুরি হয়ে পড়েছে, সে পরিমান সাহায্য করার তাওফিক আমার নেই। তবে তুমি যদি বেশির জন্য বাধ্য না কর; আমার কাছে যা আছে তা নিয়েই যদি খুশি হও, তবে আমি সাধ্যানুপাতে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

লোকটি বলল, হে আওলাদে রাসূল! আপনি যা দিবেন তা নিয়েই আমি খুশি থাকব।

হযরত হাসান রাযি. তার কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, তোমার নিকট যে তিন লক্ষ দিরহাম রক্ষিত ছিল, তা হতে যে কয়টা বাকি আছে নিয়ে এসো। কোষাধ্যক্ষ চলে গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার দেরহামের একটি বস্তা নিয়ে ফিরে এলো।

হাসান রাযি. বললেন, আরো পাচঁশত আশরাফী তো অন্য কোথাও ছিল। এগুলোও নিয়ে এসো। কোষাধ্যক্ষ নির্দেশ পালন করল।

সব হাজির হওয়ার পর হযরত হাসান রাযি. লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, দু জন কুলি নিয়ে এসো।

সে দুজন কুলি নিয়ে এলো। তিনি সবকিছু তাকে সোপর্দ করে দিয়ে নিজের গায়ের চাদরটাও খুলে দিয়ে বললেন, এটি বিক্রি করে এ দু জনের মযদুরী দেবে। আমি তোমার সম্পূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে পারিনি বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে হযরত হাসান রাযি. এর খাদেমগণ বললেন– হযরত! খাওয়ার জন্য একটি দিরহামও অবশিষ্ট নেই।

জবাবে হযরত হাসান রাযি. বললেন, আল্লাহ পাক অবশ্যই আমাকে ইহার উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন।

কি অপূর্ব দানশীলতা! সবকিছু দান করেও প্রার্থনাকারীর পুরো চাহিদা মেটাতে পারেননি বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করছেন, অনুতপ্ত হচ্ছেন। বর্তমান যুগে দানের এ অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া সত্যিই দূরহ নয় কি?

ওগো দয়াময় মাবুদ! আলোচ্য ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরাও যেন দানের হাতকে প্রসারিত করতে পারি, মানুষের প্রয়োজন পূরণে বিলিয়ে দিতে পারি নিজের সবকিছু– সেই তাওফীক তুমি আমাদের দান কর। আমীন।(সূত্র- ফাযায়েলে ছাদাকাত)

১৩/২৪৩

সত্যের জয় এভাবেই হয়

ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম। ইনসাফের ধর্ম। ইসলামের দৃষ্টিতে উচুঁ নিচু সবাই সমান। এখানে স্বজনপ্রিয়তার যেমন স্থান নেই, তেমনি পার্থক্য নেই রাজা-প্রজার মাঝেও। ইসলামী আইনে সকলের জন্য একই নিয়ম, একই কানূন। নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা এ সত্যটিই প্রকাশিত হবে সূর্যালোকের ন্যায়।

তখন ছিল হযরত আলী রাযী.এর শাসনকাল। খলিফাতুল মুসলেমীন তখন তিনিই। একদিন তাঁরই একটি ঢাল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যাচ্ছে না তো যাচ্ছেই না। অনেক খোঁজাখুঁজি হলো, অনেককে জিজ্ঞাসা করা হলো, কিন্তু ঢাল পাওয়া গেল না কোথাও।

শেষ পর্যন্ত ঢাল চুরি হয়েছে বলেই সবাই অনুমান করল।

ঢাল চুরি হলো।

হ্যাঁ চুরি হলো।

কিন্তু চুরিটা করল কে?

কেউ জানে না।

কে করল এ দুষ্কর্মটি? কার এত বড় সাহস?

সময় অনেক গড়াল। নতুন করে খোঁজ খবর নেওয়া হলো। এক সময় জানা গেল, খলিফার ঢালটি একজন ইহুদি চুরি করেছে।

কিন্তু এর কি কোনো প্রমান আছে?

হ্যাঁ আছে।

যার ঢাল তার এক ছেলে ও চাকরই হলো প্রমান। তারা ইয়াহুদীকে ঢাল চুরি করতে দেখেছে।

ঢালের মালিক কাজীর দরবারে বিচার প্রার্থী হলেন।

বিচারক বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকেই আদালতে ডাকলেন। কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন দু' জন। একদিকে ঢালের মালিক। অন্যদিকে ইহুদি।

বিচারক ইহুদিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা কি সত্য?

ইহুদি বলল, মোটেও সত্য নয়।

বিচারক তখন ঢালের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে অভিযোগ পেশ করেছেন, এর স্বপক্ষে আপনার কোনো সাক্ষী আছে কি?

হ্যাঁ জনাব, সাক্ষী আছে। মালিক বললেন।

সাক্ষী হাজির করুন।

দু' জন সাক্ষী তখন আদালতে হাজির হলো। বিচারক ফরিয়াদীকে জিজ্ঞেস করলেন-

-এরা আপনার কি হয়?

-জনাব! এদের একজন আমার ছেলে আর অন্যজন আমার চাকর।

- এছাড়া আপনার আর কোনো সাক্ষী আছে কি?

- না, আমার আর কোনো সাক্ষী নেই।

-আইনের চোখে এ ধরনের সাক্ষী অচল। বিচারক বললেন। এই সাক্ষী দিয়ে আপনি আপনার অভিযোগ টিকাতে পারবেন না। নিজের ছেলে ও চাকর দিয়ে সাক্ষীর কাজ চলে না। সুতরাং আপনার অভিযোগ নাকচ করা হলো।

বিচারকের রায় শুনে ইহুদি তো বিস্ময়ে হতবাক। হতবাক হবারই কথা। কারণ যার ঢাল চুরি হয়েছিল, তিনি হলেন মুসলিম বিশ্বের খলিফা। আর বিচারক হলেন তারই একজন কর্মচারী। বিচারক ন্যায় বিচারের স্বার্থে স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে রায় দিলেন। কোনো ধরনের স্বজনপ্রিয়তা কিংবা পক্ষপাতিত্ব করলেন না। বিশেষ কোনো সুবিধা দিলেন না রাজ্যের শাসককেও।

একজন ইসলামের মিত্র।

আরেকজন ইসলামের শত্রু।

ইসলামী আইনে শত্রু মিত্র সবাই সমান। এমন বিচার দেখে কে না অবাক হয়ে পারে?

ইহুদিও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলে উঠল,

– অপূর্ব এই বিচার! অপূর্ব সেই বিধান যা খলিফাকে পর্যন্ত খাতির করে না। আর ধন্য সেই নবী যার শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এমন মহৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবনের সৃষ্টি হতে পারে। হে মুসলমানদের নেতা! ঢালটি সত্যিই আপনার। আমিই এটি চুরি করেছিলাম। এই নিন আপনার ঢাল। শুধু ঢালই নয়, আজ থেকে আমি আমার জান মাল সবকিছু ইসলামের খেদমতে উৎসর্গ করলাম। পড়ে নিলাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

অপূর্ব বিচার দেখে ইহুদি তখনই মুসলমান হয়ে গেল। আশ্রয় নিল ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। আসলে সত্যের জয় এভাবেই হয়।

হৃদয় গলে সিরিজ কুইজ প্রতিযোগিতা পরিষদ

উপদেষ্টা- ১. হযরত মাওলানা বশীর উদ্দীন সাহেব, শাইখুল হাদীস, দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসা।

সভাপতি- হযরত মাওলানা আলী আহমদ হোসাইনী সাহেব, মুহাদ্দিস, ঐ।

সহ সভাপতি- মাওলানা হাফীজুল্লাহ, শিক্ষক, ঐ।

সম্পাদক- মাস্টার মাহবুবুর রহমান, শিক্ষক, ঐ।

নির্বাহী সম্পাদক- হাফেজ মাওলানা আব্দুল আজীজ, শিক্ষক, ঐ।

সদস্য-১. মাওলানা মুহসিনুল করীম, শিক্ষক, ঐ।

২. মাওলানা গোলামুর রহমান, শিক্ষক, ঐ।

www.smfoundationbd.com

দুশমনের সন্তান

সুলতান গাজী সালাহউদ্দীন। ন্যায় বিচারক খোদাভীরু শাসক। বীর বাহাদুরও ছিলেন তিনি। তাঁর সময়ে তাঁরই রাজ্যে একটি ঘটনা ঘটেছিল। বর্তমান শাসক ও সর্দার শ্রেণীর লোকদের জন্য বড়ই শিক্ষণীয় ঘটনা এটি।

ঘটনাটি হলো, একদিন সুলতানের এক অজ্ঞাত সৈনিক এক মহিলার কোলের শিশু চুরি করে। শিশুটি ছিল মহিলার একমাত্র সন্তান। বড় ভালবাসত সে তার সন্তানকে। আদর স্নেহে মাতিয়ে রাখত সারাক্ষণ। নিজের জীবনের চাইতেও প্রিয় ছিল সে। সন্তান হারিয়ে মহিলা পাগলের মত হয়ে যায়। কল্‌জে ছিড়ে খুন ঝরার উপক্রম হয়। কাদঁতে কাদঁতে দু চোখ ফুলিয়ে ফেলে সে।

মহিলার ভয় ছিল, তার আদরের সন্তানকে কখনোই সে ফিরে পাবে না। কারণ সে ছিল ইসলামের শত্রু পক্ষের লোক। এখন মুসলমানদের রাজত্ব। আর মুসলমানরা কি শত্রু-সন্তানকে ফিরিয়ে দেবে শত্রুর হাতে? কখনোই নয়।

কিন্তু তাই বলে তো কোনো মা আপন সন্তানের উদ্ধার তৎ পরতা থেকে বিরত থাকতে পারে না। পারে না নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে।

সন্তানকে কি করে ফিরে পাওয়া যায়, এজন্য সে দিন-রাত চিন্তা ফিকির করছিল। পরামর্শ চাচ্ছিল লোকজনের কাছে। ধর্ণা দিচ্ছিল এখানে ওখানে।

একদিন সে এলাকার এক সর্দারের কাছে গেল। বিস্তারিত খুলে বলল, সন্তান চুরি হওয়ার ঘটনা।

সুলতানের সৈনিকের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা সর্দারের ছিল না। তাই বলে সে মহিলাকে নিরাশও করল না। সে জানে, এ রাজ্যের শাসনকর্তা হলেন সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ূবী। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসক। তার কাছে ফরিয়াদ করা গেলে অবশ্যই তিনি কোনো ব্যবস্থা নিবেন।

সর্দার মহিলাকে পরামর্শ দিল। বলল, তুমি সুলতানের কাছে যাও। তাঁর কাছে ফরিয়াদ জানাও। আমার বিশ্বাস, অবশ্যই তিনি তোমার জন্য উত্তম কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সুলতান তোমার শত্রুপক্ষের লোক বলে তাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

সর্দারের কথায় মহিলার বুকে সাহস এলো। সে বুকভরা আশা নিয়ে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হলো। তারপর হৃদয় উজার করে শুরু করল কান্না ও আহাজারি।

সুলতান মমতা মিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, মা! কি হয়েছে তোমার? এমন করে কাদঁছ কেন? তোমার সমস্যা কি নির্ভয়ে খুলে বলো।

সুলতানের 'মা' ডাকটি মহিলার কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ করল। সকল ভয়ভীতি দূরীভূত হয়ে গেল তার অন্তর থেকে । সে বুকে হিম্মত নিয়ে হৃদয়ের সমস্ত আকুতি মিশিয়ে বর্ণনা করল সন্তান চুরি হওয়ার সবিস্তার ঘটনা।

মহিলা তার সন্তান হারানোর বেদনাকে এতই করুণভাবে তুলে ধরল যে, সুলতানসহ দরবারের সবাই বারবার চোখ মুছতে লাগল।

হ্যাঁ, এরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ কোলের সন্তানকে হারানো, কি যে ব্যথার, কি যে কষ্টের -তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

সুলতানের অন্তরেও সেই ব্যথা, সেই কষ্ট, সেই মর্মবেদনা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। তিনি রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। হুংকার ছেড়ে বললেন-

আমার রাজ্যে এতবড় অন্যায় কাজ করবে, এমন সাহস কার আছে? তুমি শান্ত থাকো মা। আমি এক্ষুণি খোঁজ নিচ্ছি।

এই বলে তিনি নিজে কয়েকজন লোক নিয়ে তল্লাশি চালালেন। অনেক খোঁজাখুজির পর শিশুটিকে পেলেন জনৈক সৈনিকের তাবুতে।

এরপর দোষী সৈনিকটিকেও পাকড়াও করা হলো। কঠিনভাবে শাসানো হলো তাকে। দেওয়া হলো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আর শিশুটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো তার মায়ের কোলে।

মা তার সন্তানকে পেয়ে সাত রাজার ধন পাওয়ার মত খুশি হলো। ভুলে গেল সব ব্যথা বেদনা। আর মহান সুলতানকে দিতে লাগল অসংখ্য ধন্যবাদ।

এক সাধারণ সৈনিকের দুষ্কর্মের জন্য তাকে তো সুলতান মহিলার কাছে ক্ষমা চাওয়ালেনই, নিজেও ক্ষমা চাইলেন বারবার।

প্রিয় পাঠক! দুশমনের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সুলতান সামান্যতম অবহেলা করলেন না তাকে উদ্ধার করতে। বরং নিজেই খুঁজে বের করে তাকে তুলে দিলেন মায়ের কোলে। সেই সঙ্গে ক্ষমা চাইলেন একাধিকবার। আহা! আলোচ্য ঘটনাটি পাঠ করে পৃথিবীর শক্তিমান শাসকরা যদি একটু শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

১৫/২৪৫

মৃত্যুর পর কবরের খবর

একদিন হযরত ঈসা আ.সিরিয়ার এক জঙ্গলের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ দেখলেন, একটি মৃত মানুষের মাথার খুলি পড়ে আছে। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, হে মাবুদ! তুমি আমাকে এর পরিচয় জানিয়ে দাও।

আল্লাহ তাআলা বললেন, হে ঈসা! এ খুলির পরিচয় আমার বলার প্রয়োজন নেই। তুমি নিজে জিজ্ঞেস করেই এর যাবতীয় পরিচয় জানতে পারবে।

তখন হযরত ঈসা আ. খুলিটির অতি কাছে গেলেন। বললেন, হে খুলি! আল্লাহর হুকুমে তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

সঙ্গে সঙ্গে খুলির ভেতর থেকে আওয়াজ হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রূহুল্লাহ। তারপর খুলিটি বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি কী জানতে চান জিজ্ঞেস করুন। আমি জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।

হযরত ঈসা আ. একত্রে সব প্রশ্ন করে ফেললেন। বললেন, বলতো-তুমি পুরুষ না মহিলা? পাপী না পূণ্যবান? ধনী না দরিদ্র? তুমি লম্বা না খাট ছিলে? দাতা না বখিল ছিলে? আর তোমার নামটিই বা কি ছিল?

খুলিটি জবাব দিল, হে আল্লাহর নবী! আমার নাম জমজমা। আমি একজন প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলাম। আকারে ছিলাম লম্বা। দুনিয়াতে আমার কোনো অভাব ছিল না। বহু ধন-ঐশ্চর্যের মালিক ছিলাম আমি। আমি দানবীর ছিলাম। আমি প্রতিদিন প্রায় এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা গরিব-মিসকিনকে দান করতাম। হাজার হাজার ক্ষুধার্তকে আহার করাতাম। হাজার হাজার বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান করতাম। আপনি যদি আমার আমোদ-প্রমোদ ও জাঁকজমকের কথা শুনেন, তবে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন।

আমি এভাবে আনন্দ উল্লাস করতাম যে, রক্তবর্ণ পোষাকে সজ্জিত পাঁচ হাজার অতি সুন্দরী যুবতী আমার সামনে প্রত্যহ নাচ-গান করত। আমি যখন ভ্রমনে বের হতাম, তখন জারির পোষাক পরিহিত এক হাজার অশ্বারোহী ও চার হাজার সাদা পোষাকধারী শিকারী আমার সঙ্গী হত। তাছাড়া আমার খেদমতের জন্য অগ্রে ও পশ্চাতে থাকত আরো চার হাজার গোলাম।

হে আল্লাহর নবী! আমার অধীনে শত শত রাজা বাদশাহ ছিল। যুদ্ধের মাধ্যমেই তাদেরকে আমার অধিনস্থ করেছিলাম। আমার সেনাবাহিনীর বিশালতা ও যুদ্ধের বর্ণনা শুনলে আপনি অবাক না হয়ে পারবেন না। আমি দীর্ঘ চারশত বছর নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলাম। আমি ছিলাম সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও অসীম বীর সাহসী। রূপে গুণে তখনকার সময়ে আমার মত সুন্দর আর কেউ ছিল না। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পরিচয় আমার জানা ছিল না । সেজন্য তার আনুগত্য করাও তখন আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমি ছিলাম অগ্নি উপাসক।

হযরত ঈসা আ. আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কতদিন আগে মারা গিয়েছিলে? কিভাবে তোমার মৃত্যু হয়েছিল? আর মালাকুল মউত কি অবস্থায় তোমার নিকট আগমন করেছিল?

খুলি বলল, আমি কয়েকশ বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছি। সে জামানার নবী ছিলেন হযরত ইলিয়াস আ.। তিনি আমাকে সত্য ধর্ম গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাতে কর্ণপাত করিনি।

একদিন আমি রৌদ্রালোকে বসা ছিলাম। কিছুক্ষণ পর গরমে আমার মাথাধরা অনুভূত হলো। আমি ঘরে চলে গেলাম। আমার অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে যেতে লাগল। দীর্ঘ সময় শুয়ে রইলাম। বিভিন্ন চেষ্টা তদবীর চালালাম। কিন্তু কিছুতেই শান্তি পেলাম না। অবশেষে আমার জন্য বিজ্ঞ ডাক্তার আনা হলো। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। সেবন করানো হলো দেশ-বিদেশের নামী দামী ঔষধ। কিন্তু সবই বৃথা গেল। কোনো ঔষধই আমার কোনো কাজে আসল না। আমি একরূপ জ্ঞানহীন অবস্থায় বিছানায় পড়ে রইলাম।

শোয়া অবস্থায় কত সময় অতিবাহিত হলো তা আমি জানি না। এরই মাঝে হঠাৎ কারো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সে তার সাথীকে বলছে, জমজমার জান কবজ করে দোজখে নিয়ে যাও। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মালাকুল মউত আমার সামনে এসে হাজির হলো। তার মত বিরাট ও ভয়াল আকৃতির কোনো প্রাণী ইতোপূর্বে কখনো আমি দেখিনি। তার পা ছিল জমীনে আর মাথা ছিল আসমানে। নিজকে তখন বড়ই অসহায় বোধ করলাম। মালাকুল মউত ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এলো।

তুমি কি মালাকুল মউতকে জিজ্ঞেস করেছিলে যে, তার মুখ এতগুলো কেন? হযরত ঈসা আ. বললেন।

খুলিটি উত্তর করল, হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখিন হয়েও আমি তাকে এ কথাটি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন উত্তরে সে বলেছিল, সামনের মুখ দিয়ে আমি মুমিনদের জান কবজ করার নির্দেশ দিয়ে থাকি। আর ডান, বাম ও পিছনের মুখ দিয়ে নির্দেশ দিয়ে থাকি যথাক্রমে আসমানের অধিবাসী, কাফের ও মুশরিকদের জান কবজ করার ।

হযরত ঈসা আ. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যুকালে তোমার কিরূপ কষ্ট হয়েছিল?

সে জবাব দিল, হে আল্লাহর নবী! মৃত্যুর কষ্ট যে কত কঠিন ও মারাত্মক তা আমি সেদিনই টের পেয়েছিলাম। ঐ সময় আমার মনে হয়েছিল, একই সাথে আমার উপর যেন হাজার তরবারির আঘাত পতিত হচ্ছে। সেদিন মালাকুল মউতের সাথে আরো অসংখ্য ফেরেশ্‌তা ছিল। তাদের কারো হাতে ছিল আগুনের গুর্জ। কারো হাতে ছিল আগুনের তলোয়ার। আবার কারো হাতে ছিল আগুনের তীব্র শিখা। তারা আমার কাছে এসে আমার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল। ঐ আগুনের তেজ এমন ছিল যে, মনে হয় তার একটিমাত্র কণা দুনিয়াতে পতিত হলে সমগ্র দুনিয়া জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এরপর তারা আমার দেহের শিরা- উপশিরা ধরে টানাটানি শুরু করল। আমি বহু কাকুতি মিনতি করে বললাম, তোমরা আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার রাজ সিংহাসন ও সমস্ত মালামাল গ্রহণ কর।

আমার এ কথায় ফেরেশ্‌তারা দারুণ ক্ষিপ্ত হলো। একজন আমার মুখে এত জোরে চপেটাঘাত করল যে, আমার চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। তারা কঠিন কণ্ঠে বলল, রে হতভাগা! তুই কোথায় শুনেছিস যে, মহান আল্লাহর ফেরেশগণ জানের বিনিময়ে ধন-সম্পদ গ্রহণ করে?

আমি বললাম, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমার পরিবার পরিজনসহ আল্লাহর নামে উৎসর্গিত হয়ে যাব। জবাবে তারা বলল, আল্লাহর ফেরেশ্‌তাগণ ঘুষ কিংবা প্রলোভনে প্রলোভিত হয় না। একথা বলে আর কোনো কথার সুযোগ না দিয়ে তারা আমার জান কবজ করে নিয়ে গেল।

কিছু সময় পর আমাকে দাফন করা হলো । তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার দেহে পুণঃ প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। আমি জেগে দেখলাম, চারদিকে মাটি বেষ্টিত কবরের মধ্যে আমি আবদ্ধ আছি। আমি ভীষণ ভয় পেলাম। উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠায় একেবারে এতটুকুন হয়ে গেলাম। এর অল্প সময় পর দু' দিকের মাটি

www.smfoundationbd.com

আমাকে শক্ত করে চেপে ধরল। এতে আমি কী নিদারুণ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলাম, তা প্রকাশ করার মত ভাষা আমার জানা নেই।

কবরের চাপ শেষ হতে না হতেই কিরামান কাতেবীন ফেরেশ্‌তাদ্বয় আমাকে বলে গেল, পৃথিবীতে তুমি ভাল মন্দ যেসব কাজ করে এসেছ, এখন থেকে এগুলোর ফল ভোগ করতে থাকো। এরা চলে যাওয়ার পর মুনকার নাকীর ফেরেশ্‌তাদ্বয় উপস্থিত হলো। এদেরকে দেখে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। খোদার কসম! এরূপ ভয়াবহ মূর্তি আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি।

কবরে আমি শোয়া অবস্থায় ছিলাম। ফেরেশ্‌তাদ্বয় প্রথমে আমাকে ধরে বসাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, বলো তোমার প্রতিপালক কে?

এ প্রশ্নের উত্তরে কী বলতে হবে তা আমার জানা ছিল না। তবুও তাদেরকে খুশি করার জন্য বললাম, তোমরাই আমার প্রতিপালক।

জবাব শুনে তারা আমাকে আগুনের গুর্জ দ্বারা এত জোরে আঘাত করল যে, আমি মাটির সাথে মিশে গেলাম। তবে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, এতবড় আঘাতের পরও আমার জান বের হলো না।

ফেরেশতাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, তোমার ধর্ম কি?

আমি এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। অতপর তারা আরেকটি প্রশ্ন করল। বলল, তোমার নবী কে ছিলেন?

আমি প্রবল আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম । হারিয়ে ফেলেছিলাম হিতাহিত জ্ঞান। উত্তরে কি বলতে হবে কিছুই মনে আসছিল না আমার। অবশেষে হঠাৎ বলে ফেললাম, তোমরা দুজনই আমার নবী।

আমার কথা শুনে আবারো তারা রেগে গেল। এবারের রাগ ছিল পূর্বের যে কোনো সময়ের রাগের চেয়ে অনেক বেশি। তাই জবাব শেষ হওয়া মাত্রই আমাকে আবার গুর্জ দ্বারা এমনভাবে আঘাত করল যে, আমার হাড় মাংস চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। তখন যে করুণ আর্তনাদ আমি করেছিলাম, তা যদি দুনিয়ার কোনো মানুষ শুনত, তবে সংসার ছেড়ে তখনই সে গভীর অরুণ্যে চলে যেত।

হে আল্লাহর নবী! আমি দীর্ঘ চারশ বছর শাহী তখ্‌তে বসে যে আরাম আয়েশ করেছিলাম, মাত্র একদিনের কবরের আজাবে সবকিছু আমি ভুলে গেলাম। যাহোক, ফেরেশ্‌তাদ্বয় আমার উপর বেশ কিছুক্ষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি চালিয়ে বিদায় নিল। যাওয়ার সময় বলে গেল, তোমার উপর স্থায়ী আজাব চলতে থাকুক।

কিছুক্ষণ পর আবার ঐ ফেরেশতাদ্বয় আমার কবরে প্রবেশ করে আমাকে ধরে আকাশ অভিমূখে নিয়ে চলল। অন্ধকার কবর হতে বের হয়ে আকাশের মুক্ত আলো-বাতাসে এসে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মনে আশা জাগল, এবার হয়ত কবরের আজাব থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু সে আশা আর পূরণ হলো না। কারণ অদৃশ্য হতে আওয়াজ এল, পাপিষ্ঠকে দোজখে নিয়ে যাও।

এমন সময় দোজখের দারোগা মালেক ফেরেশতা এসে বলল, একে আগুনের শিকল দ্বারা বেধে ফেল। আদেশ পাওয়া মাত্র কতিপয় ফেরেশতা এসে শিকল দিয়ে বেঁধে আমাকে নতুন এক স্থানে নিয়ে গেল। সেখানে নিয়ে আমাকে আগুনের শয্যার উপর শোয়াইয়া শরীরের চামড়া টেনে খুলে ফেলতে লাগল। তারপর তারা আমার চর্মবিহীন শরীরটাকে সত্তর গজ লম্বা আগুনের তৈরি লোহার শিকলে বেঁধে সাপ বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ একটি গভীর গর্তে ফেলে দিল। গর্তে সাপ বিচ্ছু ছাড়াও আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তাছাড়া শিকলটিও এতই উত্তপ্ত ছিল যে, তার একটি মাত্র টুকরো জমীনে রাখা হলে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেত। উল্লেখ্য যে, শাস্তি চলাকালে আমার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাই অসহ্য কষ্টে নিপতিত হয়েও কান্নাকাটি কিংবা চিৎকার দেওয়ার কোনো সুযোগ আমার ছিল না।

হযরত ঈসা আ. বললেন, জমজমা! তুমি আমাকে দোজখের কিছু বিবরণ শোনাও তো।

জমজমা বলল, হে আল্লাহর পেয়ারা নবী! আমি মোট সাতটি দোজখ দেখেছি। যথা-১. সাঈর ২. সাকার ৩. হাবিয়া ৪.জাহীম ৫. জাহান্নাম ৬. লাজা ও ৭. হোতামা। হোতামা হলো সবচেয়ে নিচু স্তরের দোজখ। আপনি দোজখবাসীদের অবস্থা দেখলে বলতেন, নিশ্চয়ই তাদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হয়েছে। সামনে, পিছে, ডানে, বামে, উপরে নিচে এক কথায় তাদের সবদিকেই জ্বলছে আগুন । জ্বলতে জ্বলতে তাদের চেহারা কয়লার মত হয়ে গেছে। আর্তনাদ করছে প্রতি মুহূর্তে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। চিৎকার করে চাচ্ছে খাবার ও পানি। কিন্তু জবাবে বলা হচ্ছে, রে হতভাগার দল! এখানে আবার খানাপিনা কিসের? আগুনই তোদের খাবার। আর তোরা হলে আগুনের ইন্ধন।

জমজমা আরো বলল, ওগো আল্লাহর নবী! এক সময় ফেরেশ্তাগণ আমাকে আগের জায়গা থেকে তুলে একটি আগুনের গাছের নিচে নিয়ে গেল। গাছটির নাম যাক্কুম গাছ। তখন আমি খানা চাইলে আমাকে উক্ত গাছের একটি কণ্ঠকযুক্ত ফল খেতে দিল। ক্ষুধার তাড়নায় আমি তা মুখে দিলাম। কিন্তু না চিবাতে পারলাম, না গিলতে পারলাম। উহা আমার গলায় আটকে গেল। আমি বের করতে চেষ্টা করলাম। বমি করতে চাইলাম। কিন্তু বমির পরিবর্তে গলা থেকে টাটকা রক্ত বের হলো।

আমি ফেরেশতাদের কাছে পানি চাইলাম। তারা আমাকে এমন উত্তপ্ত পানি পান করতে দিল যে, উহা পান করা মাত্র আমার পেটের সব নাড়িভুড়ি মলদ্বার দিয়ে বের হতে লাগল। আমার দেহের সবত্রই ছিল আগুন আর আগুন। আমি উহা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ফেরেশতাদের কাছে সামান্য কাপড় চাইলাম।

তারা বলল, রে কম বখ্ত! তুই সারা জীবন যে পাপ করেছিস তার বদলে তুই এ দোজখে একমাত্র আগুন ছাড়া আর কিছুই পাবি না। তুই নিজের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার আদেশ কখনোই মানিসনি। তার প্রদত্ত নেয়ামত ভোগ করেছিস অথচ তার শোকর আদায় করিসনি। তুই মানুষের উপর জুলুম করেছিস। তাদের হক নষ্ট করেছিস। অতএব এখন তার প্রতিফল ভোগ কর্। তোর ইচ্ছা ও চাহিদা মোতাবেক এখানে কিছুই তোকে দেওয়া হবে না। এসব বলে তারা আমাকে এক জোড়া জুতো পরতে দিল। জুতোগুলো ছিল আগুনের তৈরি। এগুলো পরিধান করার পর আমার মাথার মগজগুলো ভাতের ফেনার মত ফুটতে লাগল এবং নাক ও কানের ছিদ্র দিয়ে বের হতে লাগল।

জমজমার বিবরণ শুনে হযরত ঈসা আ. বললেন, এখন তুমি বলো আমি তোমার জন্য কি করতে পারি।

সে বলল, আপনি আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করে বলুন, তিনি যেন আমাকে এ আজাব থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠান। আমি দুনিয়াতে গিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে আসব।

হযরত ঈসা আ. তার জন্য দোয়া করলেন। বললেন, হে মাবুদ! আপনি পরম দাতা দয়ালু ও অপরাধ ক্ষমাকারী। আপনি দয়া করে এ ব্যক্তিকে আবার দুনিয়াতে পাঠান। যেন সে আপনার ইবাদত করে নেককার বান্দা হয়ে ফিরে আসতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বললেন, হে ঈসা! আমি পূর্বেই জানতাম যে, তুমি তার জন্য দোয়া করবে। যাও, আমি তার ব্যাপারে তোমার দোয়া কবুল করলাম। আর দোয়া কবুল করার কারণ হচ্ছে , সে দুনিয়ায় থাকতে আমার ইবাদত না করলেও অন্যান্য খারাপ আমলের পাশাপাশি অনেক ভাল কাজও করেছে। বিশেষতঃ সে অত্যন্ত দানশীল ও জনদরদী ব্যক্তি ছিল।

অবশেষে আল্লাহর আদেশে হযরত ঈসা আ. তার হাতের লাঠি দ্বারা উক্ত খুলিতে স্পর্শ করে বললেন, কুম বি ইজনিল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে উঠে দাঁড়াও।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার খুলিটি সম্পূর্ণ একটি মানুষে পরিণত হলো । এরপর সে আরো আশি বছর যাবত আল্লাহ পাকের একনিষ্ঠ ইবাদতে লিপ্ত থেকে পরলোক গমন করল। আল্লাহ তাআলা এবার পূর্ব জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে তাকে বেহেশ্‌তে জায়গা দান করলেন।

প্রিয় পাঠক! এখন তো আর পুনঃজন্ম নেওয়ার উপায় নেই। তাছাড়া বাদশাহ জমজমার দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার ঘটনাটিও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বৈ কিছু নয়। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাই জীবন যেহেতু একটিই, পুনরায় জন্ম গ্রহণের সুযোগ যেহেতু মোটেই নেই , তাই আসুন, এ জীবনেই আমরা আল্লাহর ইবাদত করে, তার মর্জি মোয়াফেক চলে ভয়াবহ জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের তাওফীক দাও। সূত্র-কাসাসুল আম্বিয়া,পৃষ্ঠা-৫৫৩-৫৬৭।

(আলোচ্য ঘটনাটি উল্লেখিত সূত্রের বরাত দিয়ে দিনাজপুর থেকে পাঠিয়েছেন ভাই মুহাম্মদ যায়েদ আলী)

১৬/২৪৬

অন্তিম ইচ্ছা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রাহ. তারঁ মাওয়ায়েজের মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক মজার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, কোনো এক শহরে দু'ব্যক্তি ছিল। তাদের অবস্থা ছিল মুমূর্ষু, মরণাপন্ন। মৃত্যুর একেবারেই নিকটবর্তী। দু'জনের একজন ছিল মুসলমান আর অপরজন ছিল ইহুদি।

জীবনের শেষ লগ্নে এসে ইহুদির মনে মাছ খাওয়ার সাধ জাগল। কিন্তু আশেপাশের কোথাও তখন মাছ পাওয়া যেত না । এদিকে মুসলমান লোকটির যায়তুনের তৈল খেতে ইচ্ছে হলো।

আল্লাহ পাক দু' জন ফেরেশ্তা ডাকলেন। এক ফেরেশ্তাকে বললেন, অমুক শহরে এক ইহুদি মুত্যুর কাছাকাছি সময়ে অবস্থান করছে। তার মনে মাছ খাওয়ার খাহেশ জেগেছে। তুমি এক কাজ করো, অন্য জায়গা থেকে একটি মাছ এনে তার বাড়ির পুকুরে ছেড়ে দাও। যেন সে মাছ খাওয়ার খাহেশ পূর্ণ করে মরতে পারে।

অপর ফেরেশ্তাকে বললেন, অমুক শহরে এক মুসলমান মুমূর্ষ অবস্থায় আছে। সে যায়তুনের তৈল খেতে চাচ্ছে। তার ঘরের আলমারিতে এক ডিবি তৈল আছে। তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ঐ তৈল নষ্ট করে দিয়ে এসো। যাতে সে তার অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতে না পারে।

ফেরেশ্তাদ্বয় আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে দু'জনের সাক্ষাত হলো। কথাবার্তা হলো। একজন জিজ্ঞেস করলেন-

- তুমি কোথায় যাচ্ছ?

-আমি অমুক ইহুদিকে মাছ খাওয়ানোর জন্য যাচ্ছি। সে নাকি জীবনের শেষ মুহূর্তে মাছ খাওয়ার তামান্না পেশ করেছে। আল্লাহ পাক তার তামান্নাকে পূরণ করার জন্য আমাকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমি যেন অন্য জায়গা থেকে মাছ এনে তার বাড়ির পুকুরে ছেড়ে দেই। যাতে তার লোকেরা ঐ মাছ ধরে নিয়ে তাকে খাওয়াতে পারে। এবার বলো, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

-আমি যাচ্ছি এক মুমূর্ষ মুসলমানের যায়তুন তৈল নষ্ট করে দিতে। তার নাকি তৈল খাওয়ার সাধ জেগেছে। তার এই সাধ যাতে পূরণ হতে না পারে এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে এই আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন।

উভয় ফেরেশ্‌তা সীমাহীন আশ্চর্য হলো। আশ্চর্য হওয়ারই কথা। কারণ নিয়মানুযায়ী উচিত ছিল, ইহুদির অন্তিম ইচ্ছা পূরণ না করে মুসলমানের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করা। অথচ নির্দেশ এলো সম্পূর্ণ উল্টো। কিন্তু যেহেতু এটা আল্লাহ পাকের হুকুম , যিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত , যিনি মহা প্রজ্ঞাময়; তাই ফেরেশতাদ্বয় নিজ নিজ দায়িত্ব যথাসময়ে আদায় করলেন।

দায়িত্ব পালন শেষ করে উভয় ফিরেশ্‌তা আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহ ! আমরা আপনার নির্দেশ যথাযথ আদায় করেছি। তবে এ ব্যাপারটি আমাদের বুঝে আসছে না যে, একজন মুসলমান যিনি আপনার হুকুম মেনে চলতেন, সর্বদা আপনার সন্তুষ্টি তালাশ করতেন, সেই ফরমাবরদার মুসলমানের জীবনের শেষ ইচ্ছাটি আপনি পূরণ করলেন না কেন?

পক্ষান্তরে এক ইয়াহুদি, যে আপনাকে মানে না, তার মাছ খাওয়ার সাধ জেগেছে বলে কাছাকাছি মাছ না থাকা সত্ত্বেও আপনি অন্যস্থান থেকে মাছ আনিয়ে তার সাধ পূর্ণ করলেন। এজন্য আমরা বুঝতে পারছি না যে, আসল রহস্যটা কি?

জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন, কাফের ও মুসলমানের সাথে আমার আচরণ ভিন্ন। কাফের কুফুরী করলেও মাঝে মাঝে দুনিয়াতে সে কিছু ভাল কাজ করে। যেমন, দান-খয়রাত, গরিব দুঃখির সহায়-সহযোগিতা ইত্যাদি। আমার নিয়ম হলো, ভাল কাজ যে-ই করুক না কেন, কোনো না কোনো ভাবে তাকে এর বদলা দিয়ে দেওয়া। কাফেরের কোনো নেক আমলই যেহেতু ঈমান না থাকার কারণে আখেরাতে আমার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, তাই দুনিয়াতেই আমি যে কোনো উপায়ে তাহার প্রতিদান দিয়ে দেই। যাতে আখেরাতে সে আমার নিকট কিছুই পাওনা না থাকে।

আর মুসলমানের ব্যাপারে আমি এটা চাই যে, তার গোনাহের শাস্তি আমি দুনিয়াতেই দিয়ে দেই। যাতে সে একদম নিষ্পাপ ও গোনাহমুক্ত হয়ে আমার কাছে আসতে পারে

এই ইহুদি যেসব নেক আমল করেছে , আমি সবগুলোর বদলাই দিয়ে দিয়েছি। শুধু একটিমাত্র নেক বাকি ছিল, যার বদলা তখনো দেওয়া হয়নি। তাই অন্তিম শয্যায় শায়িত হয়ে সে যখন মাছ খাওয়ার আশা করল, আমি তার সেই আশা পূর্ণ করে উক্ত নেকীর বদলা দিয়ে দিলাম। সুতরাং আখেরাতে সে আমার নিকট কিছুই পাবে না।

আর মুসলমান লোকটি জীবনে যত গোনাহ করেছিল, অসুখ বিসুখ ও অন্যান্য বিপদ আপদের মাধ্যমে তার সব গোনাহই মাফ হয়ে গিয়েছিল। তবে তার একটিমাত্র গোনাহ তখনো বাকি ছিল, যার কোনো শাস্তি সে ভোগ করেনি। লোকটি এখন আমার নিকট আসবে। যদি সে এ অবস্থায় আসে, তবে তো তার আমলনামায় এই গোনাহটিও থাকবে। তাই আমি চাইলাম যে, অন্তিম সময়ে তার সেই আশাটি পূর্ণ না হোক। এতে তার মনে যে ব্যথা লাগবে, এর দ্বারা তার ঐ গোনাহটিও মাফ হয়ে যাবে। ফলে সে আমার নিকট একদম পাক সাফ হয়ে উপস্থিত হবে।

আল্লাহ পাকের জবাব শুনে ফেরেশতাদের বুঝে আসল যে, কেন আল্লাহ পাক এমন করলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মহা হেকমতওয়ালা।

সুপ্রিয় পাঠক! আলোচ্য ঘটনা থেকে আমরা দুটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

১. মহান আল্লাহ পাক যা কিছু করেন, চাই তা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক, তাতে নিশ্চয়ই কোনো হেকমত আছে। সুতরাং কোনো ব্যাপার আমাদের বিবেক বুদ্ধিতে না ধরলে কিংবা যুক্তিতে না টিকলেই একথা বলা যাবে না যে, এটি আল্লাহ কি করলেন? কেন করলেন? এমনটি করা কি তার উচিত ছিল? ইত্যাদি।

২. মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বা অন্য কোনো সময় কারো বিপদ বা কষ্ট দেখে এরূপ ধারণা করা উচিত হবে না যে- সে পাপী, গোনাহগার, আল্লাহ পাক তার প্রতি নারাজ– এজন্যেই তার এ অবস্থা। কেননা হতে পারে আল্লাহ পাক উচুঁ মর্যাদা দান করার জন্যেই তাকে এই দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন করেছেন। (সূত্র- ইসলাহী খুতুবাত, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৭)

গরিবের অপরাধ!

ঘন কুয়াশায় ছেয়ে আছে চারদিক। শৈত্যপ্রবাহ বইছে সারাদেশে। কুয়াশার পানি টপ টপ করে পড়ছে বৃষ্টির মতো। শীতে যেন সবকিছু জমাট বেঁধে যাচ্ছে। জামা-কাপড় কোনো কিছুই শীতের সাথে আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না। হাড় কাঁপানো শীত যাকে বলে তা এবার অনুভূত হচ্ছে ভালোভাবেই। প্রচণ্ড এই শীতে সেলিনা শুয়ে আছে হাসপাতালের মেঝেতে। শীতের কারণে তার শরীর যেন বরফাবৃত হয়ে আছে। সারা রাত এক মুহূর্তের জন্যও ঘুম আসেনি চোখে। ক্ষতস্থানগুলোর ঘা আরো দগদগে হয়েছে। জোড়ায় জোড়ায় আঘাত গুলো। ফুলে মোটা হয়ে আছে। পার্শ্ব ফিরতে গেলে মনে হয় যেন জান বেরিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার যে ঔষধ লিখে দিয়েছিল, তার সিকিভাগও খাওয়া হয়নি। বাইরে থেকে ঔষধ কিনতে হবে, তাই টাকার প্রয়োজন। কিন্তু এত দামী ঔষধ কেনার টাকা পাবে? অনেক কষ্টে যোগানো শদুয়েক টাকা শেষ হয়ে গেছে সেই কবেই।

সেলিনার অসহনীয় অবস্থা দেখে ছোট ভাই কামাল বিচলিত হয়ে পড়ল। তার করারই বা কি আছে! সে এখনও সুবোধ বালক। তবু বোনের এই কষ্ট দেখে সে তো আর বসে থাকতে পারে না! এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকল। কোনো ডাক্তার আছে কি না দেখল। জরুরি বিভাগে গিয়ে কারো সাক্ষাৎ পেল না। কর্তব্যরত নার্সরাও দরজা বন্ধ করে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। ছোট মানুষ তাই কাউকে ডাক দেওয়ার সাহস করেনি। ব্যথা প্রশমনের জন্য যে ট্যাবলেট দিয়েছিল সে স্লিপটি নিয়ে কামাল বেরিয়ে পড়ল হাসপাতালের বাইরে। হাত কাঁপানো এই শীতে তার গায়ে একটি সেন্ডোজ গেঞ্জি আর হাফশার্ট। শীতের কারণে তার শরীর অবশ হয়ে আসছে। তবুও দ্রুত হাঁটতে থাকল সে। আশেপাশে কোথাও কোনো ফার্মেসী খোলা পাওয়া গেল না। এই শীতে সাত সকালে কে ফার্মেসী খুলবে!

দ্রুত হাঁটার কারণে কামালের শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার পর শাহবাগ মোড়ে এসে দেখতে পেল পিজির সামনে একটি দোকানে মিটমিট করে বাতি জ্বলছে। একটি ফার্মেসী খোলা পাওয়া গেল। স্লিপটি বের করে কামাল জানতে চাইল ট্যাবলেটটি আছে কি না। দোকানী জানাল– আছে, প্রতিটির দাম পড়বে বার টাকা। কয়টা লাগবে? কামালের মনটি দুরু দুরু করে উঠল। কারণ, তার কাছে আছে মাত্র দশ টাকা। দশ টাকার নোটটি দোকানীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে অনুরোধ করল একটি ট্যাবলেট দিতে। তার কাছে আর কোনো টাকা নেই। অন্যথায় রোগীর অবস্থা আরো অবনতি ঘটবে। দোকানী প্রথমে রাজি না হলেও তার অনুনয়-বিনয়ের কারণে সম্মত হলো। দোকানীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কামাল দ্রুত ছুটল হাসপাতালের দিকে। এসে দেখল সেলিনা আগের মতোই ছটফট করছে। ব্যথার তীব্রতায় তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। ট্যাবলেটটি খাওয়ায়ে দেওয়ার কিছুক্ষণ পর সেলিনার ঘুম চলে আসে। কামাল বোনের পাশেই বসে থাকে।

সেলিনা একজন গার্মেন্টস কর্মী। পল্লবীর একটি গার্মেন্টসে কাজ করে সে। গত সাত বছরে অনেক গার্মেন্টসে সে কাজ করেছে। এতদিন সে-ই ছিল তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম। কিছুদিন যাবত ছোট ভাই কামালও তার সহযোগী হয়েছে। ফেরি করে চা বিক্রি করে যে কয় টাকা পায় তা যোগ হয় এর সাথে। পাঁচ সদস্যের সংসারে ব্যয়ভার বহন করা তবুও সম্ভব হয় না। 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' এই অবস্থায় কোনো রকম চলছে। এক রকম সংগ্রাম করেই তারা টিকে আছে জীবনযুদ্ধে। একদিনের জন্যও আহলাদের দুটো ভাত তাদের ভাগ্যে জুটেনি। বেঁচে থাকার তাগিদে শুধু জীবনের হাল ধরে আছে। ছোট তিন ভাই-বোন ও মাকে নিয়ে সাত বছর পূর্বে সেলিনা ঢাকায় আসে। শেরপুরের নলিতাবাড়ীতে ছিল তাদের বাড়ি। সেলিনার বাবা ছিল একজন ভূমিহীন দিন মজুর। মানুষের বাড়িতে থেকে কেটেছে তাদের জীবন। তার বাবার হাড় ভাঙ্গা খাটুনির কামাই-ই ছিল প্রধান অবলম্বন। গ্রামের বাড়িতে খরচাপাতি ছিল কম। আশেপাশের মানুষেরাও সহযোগিতা করত। কিন্তু গরিবের নসীবে বুঝি দুর্গতির শেষ নেই। আচমকা এক ঝড় এসে তছনছ করে দেয় জীর্ণ এই পরিবারটিকে।

যে মহাজনের বাড়িতে থাকত, সে মহাজন জমিজমা নিয়ে গ্রাম্য লোকদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে বিরাট আকারের সংঘর্ষ বাঁধে। মহাজনের লোকজন অস্ত্রপাতি নিয়ে ঝগড়া করতে বের হয়। চাপরাশি হিসেবে সেলিনার বাপ কি আর বসে থাকতে পারে? সেও তাদের সঙ্গ দেয়। কিন্তু এক পর্যায়ে নিজ দলের একটি বর্শা এসে সেলিনার বাপের গলায় বেঁধে। ঘটনাস্থলেই মারা যায় সে। আসলে এটা ছিল মহাজনের লোকদের পরিকল্পিত। বিরোধী পক্ষকে দমানোর জন্য তাকে হত্যা করা হয়েছে। যেন মামলা শক্তিশালী হয়। দিশেহারা এই পরিবারের তখন কী অবস্থা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মামলা চলে। এতে লাভ-ক্ষতি যা সবই মহাজনের। এদের পাওয়ার কিছুই নেই।

পাঁচ সদস্যের সেলিনার পরিবার মাটি কামড়ে হলেও দেশে থাকার শত চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার আর হয়ে উঠেনি। কোনো উপায় না দেখে পাড়ি জমায় রাজধানীতে। সেলিনা নিজে কাজ নেয় গার্মেন্টসে। সামান্য আয় দিয়ে সংসার চালাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। তবুও খেয়ে না খেয়ে কোনো রকম দিন যাচ্ছিল তাদের। এতদিন ভাই কামালও কিছুটা বড় হয়েছে। সংসারের দুর্দিনের কথা বুঝার বয়স হয়েছে। তাই সে চায়ের ফ্লাক্স নিয়ে ঘুরে যা কিছু পায় তা যোগ হয় সেলিনার আয়ের সাথে। কিছুটা সহায় হয়। এভাবেই কোনো রকম কেটে যাচ্ছিল দিন।

সেদিন ছিল সোমবার। শৈত্যপ্রবাহ তীব্র আকার ধারণ করেছে। শরীরে পানির স্পর্শ লাগলে মনে হয় যেন কাঁটা বিঁধছে। সেই সাত সকালে চলে যেতে হয় গার্মেন্টসে। তাই তিনদিন যাবত সেলিনা গোসল করার সাহস পায়নি। কিন্তু গোসল না করলে তার খুবই অস্বস্তিবোধ হয়। এ তিনদিন কেটেছে অসহনীয়ভাবে। আজ একটু আগে শয্যা ত্যাগ করে। শীতের সাথে একপ্রকার আড়ি পেতেই গোসল করে নেয়। গোসল সারার পর সে অনুভব করে তার শরীর যেন শীতে বসে যাচ্ছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। ভারী কোনো কাপড় না থাকায় কোনোভাবেই তা নিবারণ করা যাচ্ছিল না। ঘড়ির দিকে তাঁকিয়ে দেখল গার্মেন্টসের সময় হয়ে গেছে। বাকি মাত্র বিশ মিনিট। এ সময় শুধু যেতেই লাগবে। কর্তব্যের টানে না খেয়েই ছুটল। গেটে ঢুকে

দেখল আটটার বাকি মাত্র এক মিনিট। যাক, বাঁচা গেল। অন্যথায় আইনের ফাঁক-ফোকরে পড়ে কাতরাতে হতো। কিন্তু তার ভেতরে যে শীত বাসা বেঁধেছে তা কিছুতেই সরছে না। সারা শরীর কাঁপছে অবিরত। দাঁতে দাঁতে টক্কর লেগে শব্দ হচ্ছে। গায়ে জড়ানো জামা আর পাতলা ওড়নাকে শীত যেন কোনো তোয়াক্কাই করছে না। এরই মধ্যে কাজ বন্টন হয়ে গেছে। সেলিনার ভাগে পড়েছে মোটা কাপড়ের গেঞ্জির বোতামের ঘর করার কাজ। কিন্তু হাতে কিছুই ধরতে পারছে না। ধরলেও পড়ে যাচ্ছে। সুঁইয়ের ভেতর সূতা ঢোকানো পর্যন্ত সম্ভব হচ্ছে না। একটি গেঞ্জি গায়ে জড়িয়ে দিলে মন্দ হয় না। এতে আর তেমন কি হবে। তখন কাজ করতেও সুবিধা হবে। এই সাত-পাঁচ ভেবে সেলিনা একটি গেঞ্জি গায়ে জড়িয়ে নিল। এবার শীত কিছুটা দুর্বল হয়ে আসে। একটু আরাম অনুভূত হয়। তাই একমনে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে সেলিনা।

সুপারভাইজারের সাথে দুদিন আগে তার একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সেদিন সে সেলিনাকে হুমকি দিয়েছিল এর প্রতিশোধ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে ছাড়বে। এরপর থেকেই সে ছিল সুযোগের সন্ধানে। সেলিনার গেঞ্জি গায়ে দেওয়ার দৃশ্যটি সুপারভাইজারের নজর কাড়ল। রাগে সে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। এবার তোমাকে বুঝাব আমার সাথে বাড়াবাড়ির পরিণতি কী! দাঁত কামড়ে মিনমিন আওয়াজে এ কথাগুলো বলতে বলতে চলে গেল এজিএম-এর রুমে। অনেক বাড়িয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। সেলিনা সম্পর্কে নানা কিছু বলল। এজিএমও কোনো কারণে তার প্রতি ছিল মহা ক্ষ্যাপা। দু'জনের রাগ একত্র হয়ে তা বিস্ফোরণের উপক্রম হল। সাথে সাথে ডাকানো হলো সেলিনাকে। সুপারভাইজারের চাহনি দেখেই সেলিনার অন্তরে ছ্যাৎ করে উঠল। এবার তার ভেতরে অপ্রত্যাশিত এক ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। দুরুদুরু মনে এগিয়ে গেল এজিএম এর রুমের দিকে। ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেল চারটি ক্ষিপ্ত চোখ তার দিকে এভাবে দৃষ্টি ফেলেছে যেন তাকে আস্ত গিলে ফেলবে। এজিএম একটি বিশ্রী গালি দিয়ে হুংকার ছেড়ে বলল– 'এই গেঞ্জি পরছিস কেন? এটা তোর বাপের না স্বামীর সম্পদ! সেলিনার মুখ থেকে কোনোও উত্তর বেরোবার আগেই তার উপর চলতে থাকল উপর্যুপরি আক্রমণ। দু'জনের সাথে যোগ হয়েছে এক দারোয়ান। তিনজনের কিল,

ঘুষি, লাথি আর সুপারভাইজারের হাতের কাঁচির আঘাতে বেহুঁশ হয়ে পড়ল সেলিনা। প্রথমে দু'একটা আর্তচিৎকার করতে পারলেও পরে মুখ চেপে ধরায় তাও সম্ভব হয়নি। এভাবে পড়ে থাকল দীর্ঘক্ষণ। সমবেদনার জন্য এগিয়ে এলো না কেউই। সহকর্মীরাও কেউ এ খবর জানতে পারেনি। উল্টো তার উপর চুরির অভিযোগ এনে পুলিশ ডাকা হলো। পুলিশ এসে তাদের পকেট ভারী করল। বিনিময়ে তাকে পৌঁছে দিল মেডিকেল পর্যন্ত। ততক্ষণে গার্মেন্টস কর্মচারীদের মধ্যে এ খবর জানাজানি হয়ে যায়। প্রতিবাদে তারা কিছু মিটিং-মিছিলের আয়োজন করে। কিন্তু মালিক পক্ষ অনড়। কিছুতেই তারা নমনীয় হলো না। উপরন্তু গার্মেন্টস বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। সাংবাদিকরা কয়েকদিন পর্যন্ত লেখালেখি করে। নারী সংগঠনগুলো বড় বড় হাঁকডাক মারে। দু'দিন যাওয়ার পর সবাই চুপসে যায়। তার কথা স্মরণ করা কিংবা চিকিৎসার খোঁজ-খবর নিতে আসেনি কেউই।

সেলিনা হাসপাতালের মেঝেতে পড়ে দশদিন ধরে কাতরাচ্ছে। সে আজ মৃত্যুর মুখোমুখি। বিভৎস এই সমাজ, নষ্ট এই মানুষগুলোর কথা ভেবে সেলিনা অভিমান করে মৃত্যুর সাথে মিতালী পাততে চায়। চায় এই আজাব থেকে মুক্তি পেতে। কিন্তু পরিবারের করুণ চিত্র, ছোট তিন ভাইবোনের নিষ্পাপ মুখগুলো তার এই ইচ্ছা পূরণে বাধ সাধে। তাই সে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। দ্রুত সেরে উঠতে চায়।

আজ এগার দিন। হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে আছে সেলিনা। মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। স্লিম ফিগার আর সৌষ্ঠব দেহখানি এখন কংকালসার। এ কয়দিনে যেন তার রূপগুণ সব অকেজো হয়ে পড়েছে। ঔষধ-পথ্য নেই, নেই কোনো শশ্রূষা, শরীর ঠিক থাকবেই বা কিভাবে। পয়সার অভাবে ঔষধপত্র খেতে পারছে না। কামালের চায়ের ফ্লাক্স আর ঘরের টুকিটাকি জিনিসপত্র বিক্রি করে যে কয়েক শ' টাকা পেয়েছিল তা তো কবেই শেষ। এখন শুধু হতাশা আর শূন্যতার মাঝে দিন কাটছে। ছোট ভাই কামাল হতাশার গ্লানি সারাদিনই বয়ে বেড়ায়। ফ্লাক্সটি থাকলে চা বিক্রি করে কয়েক টাকা পাওয়া যেত; তাও এখন সম্ভব হচ্ছে না। পরিবারের প্রধান অবলম্বন বোনকে সুস্থ করে তুলতে সে পাগলপ্রায়। কিন্তু তার নিস্ফল এই

চাওয়া অবস্থার কোনোই উন্নতি ঘটাতে পারেনি। আজ সকাল থেকে সেলিনার অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে। আস্তে আস্তে বাকশক্তিও হ্রাস পাচ্ছে। সেলিনা ইঙ্গিতে ভাইকে কাছে ডাকে। তার গলায় দু'হাত চেপে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠে। তার ভেতরের সকল দুঃখ, কষ্ট, যাতনা আর গ্লানির বাষ্প যেন বেরিয়ে আসছে একত্রে। বোনের কান্না দেখে কামাল টিকতে পারেনি। সেও ডুকরে কেঁদে ওঠে। ভাই-বোনের অঝোর ধারার এই কান্নায় চারদিকে বিরাজ করে পিনপতন নীরবতা। কাঁদার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে সে। এক সময় কান্না থেমে যায়। ভাইয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বিড়বিড় করে সেলিনা বলতে থাকে– "কামাল, আমি গেলাম। নষ্ট সমাজের কুৎসিত মানুষেরা আমাকে আর তোদের মধ্যে থাকতে দিল না। পাপিষ্ঠ এই সমাজে গরীব হয়ে জন্ম নেওয়াটাই একটি বড় অপরাধ। জানি না এই অপরাধে মানুষের কোনো হাত আছে কি না? তবুও বলি আমার মতো এই অপরাধ যেন কেউ না করে। গরীবির অভিশাপ যেন কারো উপরে না পড়ে। তুই অনেক বড় হ। মা আর বোনদের রেখে তুই আবার চলে যাবি না। বেঁচে থাকলে এই সমাজটাকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে পারবি। বুঝাতে পারবি এর রীতি। চিনতে পারবি এর বিভৎস চেহারা। কথাগুলো বলতে বলতে আটকে যায় সেলিনার দম। কামালের কোলেই ঢলে পড়ে যায়। কামাল মুখ ধরে চিৎকার করে বোনকে ডাকে। কিন্তু ততক্ষণে সেলিনা পাড়ি জমিয়েছে অচীনপুরে।

প্রিয় পাঠক! গরিব হওয়া কোনো অপরাধ নয়। গরীব ধনী আল্লাহই বানিয়েছেন। তাই গরিবদের উপর ধনীদের অত্যাচার কোনো বিবেকবান মানুষের কাম্য হতে পারে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

সূত্র : মাসিক কাবার পথে। [আলোচ্য ঘটনাটি গত ৩০ ডিসেম্বর ২০০৫ পল্লবীর একজন গার্মেন্টিস কর্মীকে গার্মেন্টিস-এর গেঞ্জি গায়ে দেওয়ার অপরাধে পিটিয়ে মারার ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।]

পাঠকের মতামত

১. সেতুবন্ধন

– মাকছুরা জাহান, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

প্রারম্ভে শুকরিয়া জানাই সেই মাবুদের .কাছে
যার করুণায় হৃদয় গলে সৃষ্টি হয়েছে।

হে হৃদয় গলে সিরিজ! তুমি মোর হৃদয়ের স্পন্দন
আর তুমিই হলে ইসলাম আর মোদের সেতুবন্ধন।

তুমিই শিখিয়েছ মোরে ইসলামী জীবন যাপন করতে
আর প্রেরণা যুগিয়েছ জীবনে পরিবর্তন ঘটাতে।

হে হৃদয় গলে সিরিজ! আমি তোমার কাছে চিরঋণী
আরো ঋণী তার কাছে, তোমায় জন্ম দিয়েছে যিনি।

মোর হৃদয়ের যে ঈমান এতদিন নিভৃতে কাঁদিত
তুমিই আমার সেই ঈমানকে করেছ শাণিত।

এতদিন মোর মাঝে ছিল এক অব্যক্ত যাতনা
তুমিই সেখানে এনে দিয়েছ এক নব চেতনা।

আমি উদ্যোগী হয়েছি আমার জীবন ঢেলে সাজাতে
আর এগিয়ে যাচ্ছি খুশির বীন বাজাতে বাজাতে।

তোমার পঠনে বিষাদের সুর হৃদয়ে উঠে বাজিয়া
আমারও হতে ইচ্ছে হয় সেই রুশী, নাহিদ, নাজিয়া।

হে হৃদয় গলে সিরিজ! তোমাকে যে পারি না ভুলিতে ভাই
তোমারই প্রেমের আগুন বলতো কি দিয়ে নিভাই?

প্রতিটি নিঃশ্বাসে মোর হৃদয়ে কেবল তোমারি স্মরণ
পারব না ওগো মেনে নিতে আমি তোমারই মরণ।

তাইতো মোর হৃদয়ে কেবল একটি কথাই জাগে
তোমার ইতি যেন না হয়, মোর মরণের আগে।

হৃদয় গলের উসিলায় এক সুন্দর জামানা
আর তার স্রষ্টার দীর্ঘায়ূ হলো আমার কামনা।

২. তোমার জুড়ি নাই

– মুহাম্মদ জুনাইদ আহমদ, এইচ, এম, এম, রোড, যশোর।

হৃদয় গলে সিরিজ তুমি শুভেচ্ছা মোর নিও
সেই সাথে মোর লেখক ভাইকে সালামটাও দিও।

হৃদয় গলে সিরিজ তুমি খুবই সরলমনা
সর্ব সময় তোমায় নিয়ে করি আলোচনা।

বিপদগামী বিপথে যখন পা দিয়েছে ভুলে
তুমিই তাকে হাত ধরে দিয়েছো পথে তুলে।

পথভোলা লোক তোমার দ্বারা পেয়েছে পথের দিশা
স্বল্প সময়ে দিয়েছো ঘুচিয়ে অন্ধকার-অমানিশা।

অনেক মানুষ হেদায়েত পেয়েছে তোমার উসিলায়
সবকিছুরই জুড়ি আছে তোমার জুড়ি নাই।

তাইতো মোরা কামনা করি, ওগো দয়াময়!
লেখক ভাইয়ের জীবনটাকে করো পূণ্যময়।

এমন লেখক জগত জুড়ে কেউ কি আর হবে?
মরে গেলেও স্মৃতির পাতায় অমর হয়ে রবে।

৩. সিরিজ পরিচিতি

– মোসাম্মত আছমা চৌধুরী, সোহাগপুর , আশুগঞ্জ, বি, বাড়িয়া।

সম্মানিত কলম সম্রাট মুফীজুল ইসলাম ভাই!
শুরুতেই আমি হাজার সালাম আপনাকে জানাই।

চৌদ্দতম সিরিজ যখন পৌঁছল আমার হাতে
লেখকের জবাব খুলে দেখলাম লিখা আছে তাতে–

সতেরতম সাজানো হবে ছড়া-কবিতা দিয়ে
পড়েই আমি ব্যস্ত হলাম, কবিতা লেখা নিয়ে।

কী লিখব? পাইনা ভেবে, বলব কি আর ভাই,
হৃদয় গলে সিরিজগুলোর, নাই তুলনা নাই।

প্রথম তিনটি সিরিজের নাম যে গল্পে হৃদয় গলে
সত্যিই ভারী চমৎকার, বলছি হৃদয় খুলে।

চতুর্থ সিরিজের নামটি হলো, যে গল্পে অশ্রু ঝরে
সিরিজটি পড়ে আনন্দে আমার হৃদয় গেল ভরে।

পঞ্চম সিরিজের নাম দিয়েছেন, যে গল্পে হৃদয় কাড়ে
যে পড়েছে সেই সিরিজটি, সে কি ভুলিতে পারে?

ষষ্ঠ সিরিজ যদি এমন হতাম হয়নাকো তার তুল্য
কে পারিবে এ জগতে দিতে তার মূল্য?

সপ্তম সিরিজ পড়ে দেখলাম, খুবই চমৎকার
ঈমানদীপ্ত কাহিনী, – নামটি দিলেন তার।

অষ্টম সিরিজ অশ্রুভেজা কাহিনী পড়ার মত বই
এত সুন্দর নামটি ভাইয়া আপনি পেলেন কই?

নবম সিরিজ নামটি তার, যে গল্পে হৃদয় জুড়ে
এমন সিরিজ কেউ পাবে না, বিশ্ব জগত ঘুরে।

দশম সিরিজের নামটি হলো, যে গল্পে হৃদয় কাদেঁ
আনন্দে আত্মহারা হলাম, উহা পড়ার স্বাদে।

হারানো দিনের সোনালী কাহিনী এগার নং সিরিজের নাম
কোটি টাকার বিনিময়েও হবে না উহার দাম।

আরো সিরিজ বের হয়েছে মজার গল্প নিয়ে
সোনালী সংসার উপন্যাসটি পড় সবাই গিয়ে।

বেশি কিছু লিখে ভাইয়া করতে চাইনা দেরি
সুখে থাকুন সবাইকে নিয়ে– এই কামনা করি।

৪. ধন্য লেখক

– হাফেজ মাওলানা আহসানুল্লাহ, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর।

মা- মাওলানা মুফীজুল ইসলামকে, জানাই ধন্যবাদ
ও- ওলামাদের গর্ব তুমি, তোমায় আশির্বাদ।

লা- লাখো পাঠকের মন গলেছে, তোমার লেখা পড়ে
না- নাই তুলনা এ ভবেতে হৃদয় গলের সনে।

মু- মুক্ত হচ্ছে তোমার দ্বারা যত অশ্লিলতা
ফী- ফী সাবিলীল্লার কাজ করছ তুমি সদা সর্বদা।

জু- জুড়ি নাই কো কোনো বইয়ের এ সিরিজের সনে
ল- লক্ষ্য করে দেখ তোমরা গোটা দেশের পানে।

ই- ইসলামের এক মহা খেদমত হচ্ছে ইহার দ্বারা
স- সবার মাঝে বইছে ব্যাপক হেদায়েতের ধারা।

লা- লাভবান কেহ হতে চাইলে, হৃদয় গলে পড়
ম- মনের অশান্তি দূর করিতে, আমল শুরু কর।

কে- কেমন লাগে পড়ে দেখ একটি মাত্র সিরিজ
জা- জানতে পারবে মজার গল্প আরো অনেক জিনিষ

না- নারী-পুরুষ সবার প্রিয় সিরিজগুলো সব
ই- ইতোমধ্যে সর্বত্রই, শুনছি যে তার রব।

ধ- ধন্য লেখক প্রিয় মোদের মাওলানা মুফীজুল
ন্য-ন্যস্তনাবুদ করে দাও ভ্রান্ত পথের মূল।

বা- বাধা যতই আসুক না কেন, থেমে যেয়ো না
দ- দয়াময় আল্লাহ সহায় হোক– এটাই কামনা।

৫. কেড়েছে আমার মন

– মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, উলচাপাড়া, বি, বাড়িয়া।

হৃদয় গলে সিরিজ তুমি খুবই সুন্দর
কেড়ে তুমি নিচ্ছ সদা, সবারই অন্তর।

হৃদয় গলে সিরিজ তুমি হও অগসর
তোমায় নিয়ে বাঁধব আমি স্বপ্নেরই বাসর।

হৃদয় গলে সিরিজ তোমায় শুনেছি যেমন
বাস্তবেও পেয়েছি, একশ ভাগ তেমন।

ঘুম আসে না তোমায় ছাড়া একলা বসে থাকি
দু' মাস অন্তর আসবে তুমি স্বপ্ন শুধু আঁকি।

তোমার দ্বারা হচ্ছে অনেক দীন-ধর্মেরই কাজ
থাকো বেঁচে গোটা জনম– এ ধরারই মাঝ।

৬. সিরিজ কিনি তবু

– মোসাম্মত মুসলিমা খাতুন, কাশিয়ানী , গোপালগঞ্জ।

হৃদয় গলে সিরিজ তুমি যেন হিরা মতি
মূর্খতার ঐ আধাঁরেতে যেন আলোক বাতি।

হৃদয় গলের সাথে কারো নাই তুলনা নাই
সাহিত্যের এক উচুঁ শিক্ষা উহার মাঝে পাই।

হিদায়েতের পথটি আছে ঐ সিরিজের মাঝে
পাঠ করলে অন্তরেতে প্রশান্তির বীন বাজে।

বিশ্বাস না হয় একটিমাত্র সিরিজ পড়ে দেখ
ভালো লাগে না এমন কথা বলতে পারবে নাকো।

হৃদয় গলে সিরিজ ছাড়া পারি না থাকতে কভু
টাকা-পয়সার অভাব থাকলেও সিরিজ কিনি তবু।

লেখক যেন চালু রাখেন, নতুন সিরিজ লেখা
সবার যেন হয় উপকার, ইসলামের হয় সেবা।

সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন লেখক যেন পান
দোজাহানে আল্লাহ তাঁকে করুন সম্মান।

৭. হৃদয়ের আকুতি

– মুহাম্মদ মোবারক বিন আনোয়ার, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।

হে হৃদয় গলে সিরিজ!
যেদিকে তাকাই সেদিকে পাই তোমাকে
যদি তুমি না আসিতে এ দুনিয়ার বুকে!
তাহলে–
কে দিত লাখো মানুষের হৃদয়ে শান্তি?

কে দূর করিত ব্যথা আর ক্লান্তি?
সত্যিই-
তোমাকে নিয়ে আমরা আজ গর্বিত
তোমাকে নিয়ে হাজারো মানুষ আনন্দিত।

ওহে হৃদয় গলে সিরিজ!
কত মানুষকে পাপাচার থেকে হেফাযত করেছো তুমি
কত মানুষ পেয়েছে সুপথ, তোমারই কদম চুমি।

তোমারই উসিলায় পর্দা ধরেছে কত যুবতী-নারী
টিভি দেখা পরিত্যাগ করে, হয়েছে তেলাওয়াতকারী।

মিথ্যার অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে, সত্যকে বানিয়েছে সাথী
ইশরাক, তাহাজ্জুদ আদায় করছে প্রতিটি দিবস-রাতি।

জানি একদিন তোমার স্রষ্টা যাবেন দুনিয়া ছেড়ে
তবু তোমার আলো ছড়তে থাকবে, গোটা বিশ্ব জুড়ে।

৮. ফুটন্ত গোলাপ

– জাকিয়া আফরীন, শরীফপুর ইসলামিয়া বালিকা মাদরাসা, বি, বাড়িয়া।

হে হৃদয় গলে সিরিজ!
তুমি দিচ্ছ সবার মনে হেদায়েতের নূর
প্রচার প্রসার হোক তোমার, দূর হতে বহুদূর।
সত্যের রাহবার তুমি, ভেঙ্গে দাও সকল বাধা
তাইতো বলি, হৃদয় গলে সিরিজ মারহাবা মারহাবা।
তুমি আমার হৃদয় রাজ্যের একটি প্রদীপমালা
সমাজ থেকে দূর করে দাও অশ্লীলতার মেলা।
তুমি আমার মনের মাঝে একটি বাঁকা চাদঁ
শত শত কলির মাঝে ফুটন্ত এক গোলাপ।
তোমায় আমি পৌঁছে দেই প্রিয়জনদের কাছে
যেন তারা তোমায় পড়ে খোদার পথে আসে।

৯. হৃদয় গলাও তুমি

– এইচ, এম, বিলাল বিন আখতার, গুলশান-২, ঢাকা।

হৃদয় গলে সিরিজ!
হৃদয় গলাও তুমি
তাইতো মোরা তোমায় নিয়ে
করি টানাটানি।

বই জগতে সেরা তুমি
বই হিসেবে দীনি
এ বই পেয়ে ধন্য হলো
কত যে মা মনি।

সাধ্য যে আর, নেই যে আমার
গুণ গাইতে তার
কিন্তু সবে মনে রেখো
নেই তুলনা তার।

১০. অমূল্য রত্ন

–রাশেদা বিনতে আমীর, মেড্ডা, বি, বাড়িয়া

হে হৃদয় গলে সিরিজ! সত্যিই তুমি মহান
তোমার পরশে আমি হয়েছি অপূর্ব, অম্লান।
তোমায় নিয়ে দেখি আমি হাজার রকম স্বপ্ন
তাইতো তুমি সবার কাছে হয়েছো অমূল্য রত্ন।
নারী জীবনের কাহিনীটা, হয়েছে চমৎকার
তোমায় নিয়ে করি আমি প্রচুর অহংকার।
আল্লাহর কাছে জানাবো আমি, এই ফরিয়াদ
তোমায় নিয়ে কাটে যেন গোটা দিন রাত।

১১. ফুলের তোরা

– মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, বাগেরহাট, খুলনা।

বাদে সালাম বলছি কালাম, ওহে লেখক ভাই!
আপনি আমার আপনি সবার
আপনাকে সবাই চাই।
হৃদয় গলে সিরিজ বলে, সরল সঠিক পন্থা
যেই পড়ে সেই ধরে
হেদায়েতের রাস্তা।
হৃদয় গলে সিরিজ চলে
জানে সর্বজন পড়ি বসে
মধুর রসে ভরে যায় মন।

১২. কেড়েছে দৃষ্টি

– আমিন বিন আশরাফ, কিশোরগঞ্জ

শুনবে তোমরা একটি গল্প
কথা বেশি নয়, খুবই অল্প,
বাজারে এসেছে, একটি জিনিষ
নামটি তার হৃদয় গলে সিরিজ।
সারাদেশে সুনাম, হয়েছে সৃষ্টি
বই প্রেমিকদের, কেড়েছে দৃষ্টি।
তার ধমনীতে বহমান আকাবেরের রক্ত
আছে তার পৃথিবীতে অগনিত ভক্ত।

১৩. অপূর্ব সিরিজ

– মুহাম্মদ শামসুল হক, নাসির নগর, বি, বাড়িয়া।

হৃদয় গলে সিরিজ তুমি, সত্যিই অপূর্ব
তাইতো আমি তোমায় নিয়ে, করি গর্ব।
হৃদয় গলে সিরিজ তুমি, মুগ্ধ করলে মন
তাইতো আমি ভালবাসব, তোমায় আজীবন।
হৃদয় গলে সিরিজ তুমি, কাড়লে সবার মন
তুমি সবার প্রিয় সিরিজ, সবার আকর্ষণ।
হৃদয় গলে সিরিজ তোমার, অনেক গুণগান
তাইতো তুমি সবার মনে, করে নিয়েছো স্থান।
হৃদয় গলে সিরিজ তোমার, হয়না তুলনা
তোমায় আমি রাখব স্মরণ, ভুলে যাব না।
হৃদয় গলে সিরিজ তোমার, নাই তুলনা নাই
তুমি আরও সামনে বাড়বে, এটা সবাই চাই।

১৪. মুগ্ধ করলে মন

– মোসাম্মত সালমা সুলতানা, কুলানন্দপুর, দিনাজপুর।

হৃদয় গলে সিরিজ তুমি অতি সুন্দর
তুমি সদা মুগ্ধ করছ, সবারই অন্তর।
হৃদয় গলে সিরিজ তুমি, লাল গোলাপের মত
আনন্দে আত্মহারা হই, তোমায় পড়ি যত।
হৃদয় গলে সিরিজ তুমি, মুগ্ধ করলে মন
তোমায় নিয়ে ব্যস্ত আমি, থাকি সারাক্ষণ।

১৫. আমার ভালবাসা

– মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন বশীর, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী

হৃদয় গলে সিরিজ তুমি কত যে ভালো!
তোমার দ্বারা লাখো মানুষ পেয়েছে দীনের আলো।

হৃদয় গলে সিরিজ তোমায় অশেষ ধন্যবাদ
দীন ইসলামকে তুমি করছ পুনরায় আবাদ।

হৃদয় গলে সিরিজ তুমি আমার ভালবাসা
হৃদয় গলে সিরিজ তুমি দীনের আলো-আশা।

তোমার কথা বলে বেড়ায় গ্রাম-শহরের লোকে
তোমার মরণ হয় না যেন, এ পৃথিবীর বুকে।

১৬. লাল গোলাপ

– মুহাম্মদ মাসউদুর রহমান-২, দড়াটানা মাদরাসা, যশোর।

সিরিজ যেন সোনার দেশের লাল গোলাপ ফুল
সেই সিরিজের পরশ পেয়ে ধন্য মানবকুল।

লেখক যেন নীল আকাশের রঙধনুদের মত
তার আলোতে এই ভূবনে হাসলো আলো শত।

গাছে গাছে ফুল ফুটেছে. সূর্য দিচ্ছে আলো
সকাল-সাঝে সিরিজগুলো পড়তে কত ভালো।

পাখিরা সব ডানা মেলে গাইছে কত গান
হৃদয় গলে সিরিজ যেন মোদের মুক্ত প্রাণ।

সিরিজ-কিরণ ঠিকরে-পড়ায়, মুছে গেল কালো
অমানিশার প্রাচীর ঠেলে উঠল হেসে আলো।

সমাপ্তিতে প্রার্থনা মোর ওগো দয়াময়
কবুল করো লেখক ভাইকে গোটা বিশ্বময়।

৩০. একটি ফুল

– রেজাউল করিম, জামেয়া ইসলামিয়া দড়াটানা মাদরাসা, যশোর।

হৃদয় গলে সিরিজ নামে ফুটল একটি ফুল
তার জন্য সকল মানুষ হচ্ছে যে ব্যাকুল।

ফুল বাগিচায় বুলবুলিরা যেমন করে খেলা
তেমনি আমি সিরিজগুলি পড়ি বিকাল বেলা।

মালি যেমন ফুল বাগিচা করে পরিপাটি
সিরিজগুলি পড়লে ভাই, ঈমান হবে খাঁটি।

বসন্তকালে কালো কোকিল, যেমন করে গান
সিরিজগুলি বাড়িয়ে দিল সবার দীনি জ্ঞান।

সিরিজগুলি পড়ে সবাই হচ্ছে ঈমানদার
পণ করেছে মনে মনে গুনাহ করবে না আর।

অবশেষে দোয়া করি ওগো মাওলা পাক!
প্রকাশক ও লেখক ভাইকে দিয়ে দাও নাজাত।

৩১. কাজে লাগবে বেশ

–রাশেদা আক্তার রিয়া, কসবা, ধর্মপুর, ফেনী।

হৃদয় গলের সকল সিরিজ
পাড়ি দিয়েছি মোরা,
কুইজ প্রতিযোগিতার ডাক আসিলে
পারব দিতে সাড়া।

হৃদয় গলের প্রতিটি গল্প
এক একটি উপদেশ।
জীবন গড়তে গল্পগুলো
কাজে লাগবে বেশ।

এই সিরিজের সকল পাঠক
থাকবে তোমার সাথে
হৃদয় গলের লেখক তুমি
লেখ দিবস রাতে।

৩২. হৃদয় গলে সিরিজ মানে

=মুহাম্মদ নূরে আলম, সাইনবোর্ড, ডেমরা, ঢাকা।

হৃদয় গলে সিরিজ মানে
প্রভূর সনে খেলা,
হৃদয়গলে সিরিজ মানে
সাহিত্যের এক মেলা।

হৃদয় গলে সিরিজ মানে
জানা ও শিখা,
হৃদয় গলে সিরিজ মানে
জীবন পথের দিশা।

৩৩. স্বর্ণের অলংকার

–শফিকুল ইসলাম রায়পুরী, আশুগঞ্জ, বি.বাড়ীয়া

লিপির প্রারম্ভে জানাই সালাম, শ্রদ্ধেয় লিখক ভাই,
সুস্থ যেন রাখেন প্রভু সেই ফরিয়াদ জানাই।

লিখক ভাইয়ার প্রসংশায় কি লিখব আর–
ভাবি আমি আপনি যেন কলম সৈনিক সর্দার।

বিশ্ব বাসীর সামনে আপনার ফুটলো দক্ষতা,
আরও ভাবি আপনি একজন ঔপন্যাসিক নেতা।

আপনার কিছু সিরিজের নাম যে গল্পে হৃদয় গলে,
সেগুলো পড়লে মজা লাগে সকল লোকে বলে।

হৃদয় গলে সিরিজের বই কাঁদাল মোর মন,
এগুলো মোর জীবন সঙ্গী অমূল্য রতন।

ধরণীতে এমন লিখক হয়নি কভু আর,
আপনার হাতের লিখনি যেন স্বর্ণের অলংকার।

স্মৃতি হয়ে থাকবে যেন আপনার হাতের লিখা,
সালাম জানিয়ে নিলাম বিদায় আগাম হবে দেখা।

বি. দ্র. যাদের কবিতা ছাপা হয়েছে তারা অতি শীঘ্রই পূর্ণ নাম ঠিকানা লিখে লেখক বরাবর পাঠিয়ে দিন। সৌজন্য কপি ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

হৃদয় গলে সিরিজ কুইজ প্রতিযোগিতা-১ এর ফলাফল

১. **জাহিদ হাসান** : পিতা- মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন, দক্ষিণ মির্জানগর, হাসনাবাদ, রায়পুরা, নরসিংদী।

২. **রিফাত মোল্লা** : পিতা- আব্দুল হামিদ মোল্লা, ১১১/৩ উত্তর সাটির পাড়া, নতুন বাজার, নরসিংদী।

৩. **মোসাম্মত জেনিফা আক্তার** : প্রযত্নে- মুহাম্মদ হায়াত আলী, গ্রাম- রায়পাড়া, পোঃ জয়পাড়া, থানা- দোহার, ঢাকা।

৪. **মুহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন** : প্রযত্নে -মুহাম্মদ শহীদ মিয়া, গ্রাম- খোল্লাকান্দি কান্দি (ঈদগাহ বাড়ি), নবীনগর, বি-বাড়িয়া।

৫. **মুহাম্মদ ফরহাদ মিয়া** : পিতা- আবুল হোসেন, গ্রাম ও পোঃ আলোকবালী পূর্ব পাড়া, নরসিংদী সদর।

৬. **মোসাম্মত মাহবুবা আখতার** : পিতা- মুহাম্মদ জাকির হোসাইন, পূর্ব পাইক পাড়া, বাসা নং- ৫০৮, বি, বাড়িয়া।

৭. **মোসাম্মত শিফা আখতার** : পিতা- মুহাম্মদ ইব্রাহিম খলীল (বকুল), গ্রাম- শাওড়া তলী, পোঃ- আশারামপুর, থানা- রায়পুরা, জেলা- নরসিংদী।

৮. **মোসাম্মত আমেনা আখতার মুক্তা** : প্রযত্নে- হাফেজ মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, পোঃ বাজার হাসনাবাদ, রায়পুরা, নরসিংদী।

৯. **মুহাম্মদ মিজানুর রহমান** : জামাতে জালালাইন, বৌয়াকুড় মাদরাসা, নরসিংদী।

১০. **মুসাম্মত সালমা আখতার** : পিতা-সাঈদ আহমদ, শিবপুর উপজেলা মসজিদ সংলগ্ন , পোঃ ও থানা- শিবপুর ,নরসিংদী।

১১. **মোসাম্মত সখিনা খাতুন** : পিতা- মুহাম্মদ সোলায়মান খন্দকার, গ্রাম -মাঝিপাড়া পোঃ শাহী বাজার, বলদিয়া, থানা -ভূরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

১২. **মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন** : পিতা- মুহাম্মদ সোলায়মান, গ্রাম- পর্শুরামের কুটি, পোঃ শাহী বাজার, বলদিয়া, থানা- ভূরঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

১৩. **মুহাম্মদ দুলাল মিয়া** : পিতা মুঙ্গল মিয়া, পোঃ আলোকবালী, নেকজানপুর নরসিংদী।

১৪. **মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন** : পিতা- আব্দুল হামিদ, পোঃ শম্ভুপুরা উচ্চ বিদ্যালয়, আড়াই হাজার, নারায়নগঞ্জ।

১৫. **মোসাম্মত ফাতেমা খাতুন** : পিতা- মুহাম্মদ হাফেজ সাহেব, গ্রাম- গোসাইপুর পোঃ পীরগন্জ হাট, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

১৬. **মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম** : পিতা-মুহাম্মদ মোর্শেদ মোল্লা, বিলশরণ পোঃ নিনগাঁও বাজার, শিবপুর, নরসিংদী।

১৭. **মুহাম্মদ কবীর হোসাইন** : পিতা- মুহাম্মদ দুলা মিয়া, শ্রীনগর আরাবিয়া রওজাতুল উলূম মাদরাসা, পোঃ সায়েদাবাদ, রায়পুরা, নরসিংদী।

১৮. **মুহাম্মদ আল আমীন** : জামাতে কাফিয়া, জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম দেওভোগ, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।

১৯. **মুহাম্মদ জোবায়ের আহমদ** : পিতা- মুহাম্মদ সারোয়ার, গ্রাম- স্বল্প পেনাই দিঘীর পাড়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

২০. **মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইলিয়াছ হুসাইন** : মাদরাসাতুল এহসান ২ নং সেক্টর, উত্তরা, ঢাকা।

আরো যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

১. ইয়াছমিন আক্তার, নরসিংদী সদর।
২. হাছান উল্লাহ,নাছির নগর, বি-বাড়িয়া।
৩. সাইফুল্লাহ চৌধুরী, নরসিংদী সদর।
৪. এনামুল হক,বৌয়াকুড়,নরসিংদী।
৫. আইয়ূব আলী ,তিতাস, কুমিল্লা।
৬. মানিক, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
৭. সাইফুল ইসলাম, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
৮. আলী হুসাইন,যাত্রাবাড়ী,ঢাকা।
৯. সামসুন্নাহার, নরসিংদী সদর।
১০. শাহানাজ পারভীন, ব্রাহ্মন্দী, নরসিংদী।
১১. আখতার ফারুক,যশোরী, দেওভোগ মাদরাসা, নারায়নগঞ্জ
১২. মাকসুদুল হক ফ.পুরী,হাটহাজারী মাদরাসা।
১৩. শরীফ আহমদ দেওভোগ মাদরাসা, নারায়ন গঞ্জ।
১৪. কব্বির হোসাইন,দেওভোগ মাদরাসা, নারায়নগঞ্জ।
১৫. আরজুদা বেগম, নরসিংদী সদর।
১৬. শহীদুল ইসলাম, বাঘার পাড়া, যশোর।
১৭. ইমরান, পলাশ, নরসিংদী।
১৮. রবিন মিয়া, বীরপুর,নরসিংদী।
১৯. মুফতী আবুল বাশার, সোনাপুর, নোয়াখালী।
২০. সাহীদা আখতার,নরসিংদী সদর।
২১. মনিরুল ইসলাম জামিল মাদরাসা ,বগুড়া।
২২. ইউসুফ বিন রফিক, দেওভোগ মাদরাসা।
২৩. মাহমুদুল হাসান , নজরপুর, নরসিংদী।
২৪. আব্দুর রহমান, দোহার , ঢাকা ।
২৫. জাকারিয়া হোসাইন সিরাজী, জামিল মাদরাসা,বগুড়া।
২৬. জাকারিয়া ইবনে রুহুল আমিন, ঐ
২৭. তাজুল ইসলাম, নবীনগর, বি-বাড়িয়া।
২৮. আবু মুসা, শিবপুর, নরসিংদী।
২৯. আসমা আক্তার, হুমনা, কুমিল্লা।
৩০. ইয়াসমিন আক্তার, শিবপুর, নরসিংদী।
৩১. ইসমাইল হোসেন, হাজীপুর, নরসিংদী।
৩২. আনিসুর রহমান, রায়পুরা , নরসিংদী।
৩৩. আবদুল্লাহ আল ফারুক, দেওভোগ মাদরাসা।
৩৪. ইলিয়াস,দত্তপাড়া মাদরাসা।
৩৫. আয়েশা সিদ্দীকা ,দোহার, ঢাকা।
৩৬. রেদওয়ানুল আহসান, জামিল মাদরাসা।
৩৭. মাওলানা আরিফুজ্জামান, সাবগ্রাম, বগুড়া।
৩৮. হাসিব আহসান, শিবপুর , নরসিংদী।
৩৯. সালমা বেগম, আলোকবালি, নরসিংদী।
৪০. হালিমা সাদিয়া, বেলাবো , নরসিংদী।
৪১. ইবরাহীম , জামিল মাদরাসা,বগুড়া।
৪২. সুজাত হোসেন, আটপাড়া নেত্রকোনা।
৪৩. জসিম উদ্দিন, রায়পুরা , নরসিংদী।
৪৪. ইসমাইল হোসাইন, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
৪৫. আব্দুল আউয়াল, গোপালপুর, টাঙ্গাইল।
৪৬. মারজিয়া আক্তার, রায়পুরা, নরসিংদী।
৪৭. মাহবুব আলম, জামিল মাদরাসা, বগুড়া।
৪৮. মোবারক হোসেন, শিবপুর, নরসিংদী।
৪৯. সাগর হোসেন, কোতয়ালী, ফরিদপুর।
৫০. জোছনা বেগম, সুনামগন্জ সদর।
৫১. সৈয়দ মুহাম্মদ শরীফ মিয়া. শিবপুর, নরসিংদী।
৫২. সৈয়দ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, শিবপুর, নরসিংদী।
৫৩. মাসুদ বিন আতহার ,হুমনা ,কুমিল্লা।
৫৪. এম, এস সুমি, বি, বাড়িয়া সদর।
৫৫. মাওলানা মিজানুর রহমান, বি, বাড়িয়া সদর।
৫৬. জুবায়ের বিন মিজান, লালবাগ, ঢাকা।
৫৭. মৌসুমী আখতার, টঙ্গী ,গাজীপুর।
৫৮. রুহুল আমীন, দত্তপাড়া , নরসিংদী।

www.smfoundationbd.com

৫৯. ইমামুল কবীর, বাঘার পাড়া যশোর।
৬০. বেলাল হোসাইন, লালবাগ , ঢাকা।
৬১. হাবিবুর রহমান, মুজিব নগর, মেহেরপুর।
৬২. সাদেকুর রহমান ,মুজিব নগর, মেহেরপুর।
৬৩. সানোয়ারা বেগম, ধর্মপাশা, সুনামগন্জ।
৬৪. জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস, মনিরামপুর, যশোর।
৬৫. আলী হোসেন, ধর্মপাশা, সুনামগন্জ।
৬৬. নাজমুল হক নাজিম, জয়নগর বাজার, সুনামগন্জ।
৬৭. নাজনীন আখতার সানী, জয়নগর বাজার, সুনামগন্জ।
৬৮. জাকারিয়া,জয়নগর বাজার, সুনামগন্জ।
৬৯. ইয়াসমিন আখতার, জামাল গন্জ, সুনামগন্জ।
৭০. আলী হাসান, সুনামগন্জ সদর।
৭১. ক্বারী আমীন উদ্দীন,সুনামগন্জ সদর।
৭২. মুসলেহ উদ্দীন ,সুনামগন্জ সদর।
৭৩. মাহফুজা আখতার ,সুনামগন্জ সদর।
৭৪. আহমদুল হক নাঈম, সিলেট সদর।
৭৫. সোহাইল আহমদ, সিলেট সদর।
৭৬. রাবেয়া বেগম, সিলেট সদর।
৭৭. শাকেরা বেগম উসমানী নগর সিলেট।
৭৮. আব্দুর রহমান কাফীল, সুনামগন্জ সদর।
৭৯. মাহমুদুল হাসান ,সুনামগন্জসদর।
৮০. সাদ্দাম হোসেন ,সুনামগন্জ সদর।
৮১. জুবেদা খাতুন ধর্মপাশা ,সুনামগন্জ।
৮২. তাওহীদুর রহমান কোতয়ালী যশোর।
৮৩. আবু তালেব, সরিষাবাড়ি ,জামালপুর।
৮৪. তালাদ হোসেন পাংশা, রাজবাড়ি।
৮৫. আবু সালিম খান কাশিয়ানী, গোপালগন্জ।
৮৬. খাদীজা খাতুন, ফকির হাট, বাগেরহাট।
৮৭. আব্দুর রহমান, দেওভোগ মাদরাসা
৮৮. আব্দল খালেক , আমতলী , বরগুনা।
৮৯. সাইফুল ইসলাম, রায়পুরা, নরসিংদী।
৯০. সাইফুল ইসলাম, বেলাব, নরসিংদী।
৯১. নূর হোসাইন, বেলাব, নরসিংদী।
৯২. সুমাইয়া আখতার, রায়পুরা, নরসিংদী।
৯৩. আল আমীন নাহিদ, মনোহরদী, নরসিংদী।
৯৪. উমর ফারুক, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
৯৫. আমজাদ হোসাইন, আলোকবালি, নরসিংদী।
৯৬. আল আমীন, নজরপুর, নরসিংদী।
৯৭. সাইফুল ইসলাম, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
৯৮. সাদত আলী, রায়পুরা, নরসিংদী।
৯৯. রায়হান উদ্দীন, রায়পুরা, নরসিংদী।
১০০. আল আমীন, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
১০১. রহমত উল্লাহ ,শিবপুর, নরসিংদী।
১০২. মাওলানা আবুল কাসেম, নরসিংদী সদর।
১০৩. আব্দুল হালিম রাসেল ,নরসিংদী সদর।
১০৪. আব্দুল্লাহ , রায়পুরা ,নরসিংদী ।
১০৫. আবু সালেহ, বেলাব নরসিংদী।
১০৬. ইমরান হোসাইন, বেলাব ,নরসিংদী।
১০৭. আশরাফ আলী , রায়পুরা, নরসিংদী।
১০৮. সালমান , রায়পুরা , নরসিংদী।
১০৯. সাইদুর রহমান জুয়েল, দুর্গাপুর, রাজশাহী।
১১০. শাহীন সরকার ,বি,বাড়িয়া সদর।
১১১. নূরুন্নাহার রিমা, মাধবপুর, বি, বাড়িয়া।
১১২. সগীর আহমদ, বাঞ্ছারামপুর, বি, বাড়িয়া।
১১৩. শারমিন শিলা, বাঞ্ছারামপুর, বি, বাড়িয়া।
১১৪. মাকসুদা বেগম,বাঞ্ছারামপুর, বি, বাড়িয়া।
১১৫. শামায়েল আহমদ, বি, বাড়িয়া সদর।
১১৬. রবিউল্লাহ,বাঞ্ছারামপুর, বি, বাড়িয়া।
১১৭. বুশরা খাতুন, পাইক পাড়া, বি, বাড়িয়া।
১১৮. জসিম উদ্দীন আহমদ, নাসির নগর, বি, বাড়িয়া।
১১৯. রোকেয়া বেগম, বি, বাড়িয়া সদর।
১২০. হেদায়তুল্লাহ, আশুগন্জ, বি, বাড়িয়া।
১২১. তানজিনা আখতার বি, বাড়িয়া সদর।
১২২. আকুল কালাম আজাদ, সোনাই মুড়ী, নোয়াখলী।

১২৩. হালিমা বেগম, বোয়ালমারি, ফরিদপুর।
১২৪. মাওলানা শোয়াইব , কচুয়া, চাঁদপুর।
১২৫. তাহমিদা, বানিয়াচং, হবিগন্জ।
১২৬. ফারজানা আখতার, বেলাব, নরসিংদী।
১২৭. কারিমা আখতার, আমতলী, বরগুনা।
১২৮. মাহববুর রহমান, ভাষানটেক, ঢাকা।
১২৯. আবু বকর, কোতয়ালী, বরিশাল।
১৩০. আতাউর রহমান, সুনামগন্জ সদর।
১৩১. তাছলিমা বেগম, সুনামগন্জ সদর।
১৩২. মাইনুল ইসলাম, নরসিংদী সদর।
১৩৩. রকিবুল ইসলাম, নরসিংদী সদর।
১৩৪. বাদশাহ ফয়সাল, নরসিংদী সদর।
১৩৫. শফীকুল ইসলাম, নরসিংদী সদর।
১৩৬. আজীজুল হক, নরসিংদী সদর।
১৩৭. কামাল উদ্দিন, বাঞ্ছারামপুর, বি, বাড়িয়া।
১৩৮. বিলাল হোসাইন, শিবপুর, নরসিংদী।
১৩৯. মামুনুর রশীদ, নরসিংদী সদর।
১৪০. আতিকুর রহমান, নরসিংদী সদর।
১৪১. মুআযযম আলী টঙ্গী, গাজীপুর।
১৪২. কফিল উদ্দীন, পাংশা, রাজবাড়ি।
১৪৩. আবরারুল হক, নরসিংদী সদর।
১৪৪. আব্দুল মুমিন, নরসিংদী সদর।
১৪৫. হাবীবুল্লাহ, নরসিংদী সদর।
১৪৬. বিলাল হোসাইন,নরসিংদী সদর।
১৪৭. তামান্না, নরসিংদী সদর।
১৪৮. আবুল হাসিম,নরসিংদী সদর।
১৪৯. আলমগীর হোসাইন, রায়পুরা, নরসিংদী।
১৫০. শাহিদা আখতার, শিবপুর,নরসিংদী ।
১৫১. আকলিমা আখতার, শিবপুর, নরসিংদী ।
১৫২. উবায়দুল্লাহ, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
১৫৩. সাদ্দাম হোসাইন, রায়পুরা, নরসিংদী।
১৫৪. শফী উদ্দীন, রায়পুরা, নরসিংদী ।
১৫৫. মারজানা আখতার, আটপাড়া, নেত্রকোনা।
১৫৬. মোখলেছুর রহমান, রায়পুরা, নরসিংদী ।
১৫৭. ইলিয়াস বক্তাবলী, দেওভোগ মাদরাসা, নারায়নগন্জ।
১৫৮. নাজমুন্নাহার নাজু, শিবপুর, নরসিংদী।
১৫৯. রকিবুল হক, রায়পুরা, নরসিংদী ।
১৬০. সিরাজুল ইসলাম, পলাশ , নরসিংদী।
১৬১. আব্দুর রহমান, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
১৬২. নাসিরুদ্দীন, আড়াইহাজার নারায়ণ গনজ
১৬৩. শফীকুল ইসলাম, নরসিংদী সদর।
১৬৪. সানিয়া, শিবপুর, নরসিংদী।
১৬৫. সুমন মিয়া, রায়পুরা, নরসিংদী।
১৬৬. সাদ্দাম হোসাইন, রায়পুরা
১৬৭. জোনাইদ আহমদ, দড়াটানা মাদরাসা, যশোর।
১৬৮. তহুরা আখতার, কোতয়ালী ,সিলেট।
১৬৯. বুরহান উদ্দিন, কুষ্টিয়া সদর।
১৭০. মাসউদুর রহমান, দড়াটানা মাদরাসা।
১৭১. দেলোয়ার হোসেন, মুজিব নগর মেহেরপুর।
১৭২. রেজাউল হক, জীবন নগর, চুয়াডাঙ্গা।
১৭৩. ইয়াসিন, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী।
১৭৪. হিফজুর রহমান, সুনামগনজ সদর।
১৭৫. লুবাবা আখতার সুনামগনজ সদর।
১৭৬. হাফেজ মাওলানা আহসানুল্লাহ, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর।
১৭৭. ইয়াসিন দত্তের হাট, নোয়াখালী।
১৭৮. এনামুল হাসান, আড়াই হাজার, নারায়নগনজ
১৭৯. আতিকুর রহমান, রায়পুরা, নরসিংদী।
১৮০. শামীম শিবপুর, নরসিংদী।
১৮১. হালিম আক্তার দাগান ভুঞা ফেনী
১৮২. আব্দুল্লাহ আল মামুন, দড়াটানা মাদরাসা, যশোর।
১৮৩. খালেদা আখতার,হালিমা সাদিয়া মহিলা মাদরাসা, ভৈরবপুর।

১৮৪. জিন্নাত আখতআর,নরসিংদী সদর।
১৮৫. গোলাম রাজ্জাক,নরসিংদী সদর।
১৮৬. ওমর ফারুক, পাচদোনা, নরসিংদী সদর।
১৮৭. আবু তালহা,জামিল মাদরাসা,বগুড়া।
১৮৮. মামুনুর রশিদ, জামিল মাদরাসা, বগুড়া।
১৮৯. আবু ইউসুফ নোমান.পাচদোনা, নরসিংদী
১৯০. রুকছানা আখতার, আড়াই হাজার, নারায়নগনজ।
১৯১. কেফায়তুল্লাহ ইবনে রহমতুল্লাহ, মির্যানগর, নরসিংদী।
১৯২. ইয়াছিন মিয়া,নরসিংদী সদর।
১৯৩. হাবিবুল্লাহ চৌধুরী, বৌয়াকুর মাদরাসা, নরসিংদী।
১৯৪. খোরশেদ আলম,রায়পুরা,নরসিংদী।
১৯৫. ফাহিম মিয়া,নরসিংদী।
১৯৬. শাহিদুর রহমান শাহিদ, বাঘার পাড়া, যোশর।
১৯৭. আবু বকর সিদ্দীক, দত্তপাড়া, নরসিংদী।
১৯৮. মঈন উদ্দীন নবীনগর,বিবাড়িয়া।
১৯৯. আলী হাজারী,বিববড়িয়া।
২০০. শফিকুল ইসলাম,ফুলপুর,ময়মসিংহ।
২০১. শরীফুল ইসলাম,নরসিংদী।
২০২. হীমা আখতার,নরসিংদী সদর।
২০৩. মুফতি খলিলুর রহমান, ইসলাম পুর মাদরাসা, নরসিংদী
২০৪. জান্নাতুল ফেরদৌসী, গোপালপুর, টাঙ্গাইল।
২০৫. আমান উল্লাহ,রায়পুরা,নরসিংদী
২০৬. হাফছা খাতুন,নাটোর।
২০৭. মাহবুবুর রহমান,নাটোর।
২০৮. আল আমিন,জামাত,তাকমিল,বৌকুর মাদরাসা,নরসিংদী
২০৯. ইমরান হুসাইন ইবনে হাবিব, জামিল মাদরাসা, বগুড়া।
২১০. মাহমুদুল হাসান, জামিল মাদরাসা, বগুড়া।
২১১. সাইফুদ্দিন,জামিল মাদরাসা,বগুড়া
২১২. সুমি আখতার,ঘোড়াঘাট,দিনাজপুর
২১৩. মানছুরা আখতার,নরসিংদী
২১৪. ফাতেমা আখতার,সরাইল,বিবাড়িয়া
২১৫. আব্দুল্লাহ আল মামুন,নরসিংদী সদর
২১৬. করিম,ভাদুঘর,বিবাড়িয়া
২১৭. ছাবিনা আখতার, বানছারামপুর, বিবাড়িয়া।
২১৮. হাফেজ সাইফুল্লাহ,লালবাগ,ঢাকা
২১৯. হুসাইন আহমদ.মেহেরপুর সদর
২২০. নুরুল আমীন,মনার গনজ,কুমিল্লা
২২১. রুহুল আশ্রাফ,কোতয়ালী,যশোর।
২২২. মেহেদী হাসান, বি, পাড়া, কুমিল্লা।
২২৩. এমদাদুল হক, শিবপুর, নরসিংদী
২২৪. সানাউল্লাহ, নরসিংদী সদর
২২৫. জোবায়ের আহমদ, বেলাব, নরসিংদী
২২৬. ইলিয়াছ, নরসিংদী সদর
২২৭. সোহেনা বেগম, নরসিংদী সদর
২২৮. রফিকুল ইসলাম, নরসিংদী সদর
২২৯. তহিনা আখতার,নরসিংদী সদর
২৩০. জাকারিয়া, দিঘিনালা, খাগড়াছড়ি
২৩১. আজমল হোসেন,নরসিংদী সদর
২৩২. আবু বকর, নরসিংদী সদর
২৩৩. আরিফ হোসাইন, বরুড়া, কুমিল্লা
২৩৪. মাহমুদা,নরসিংদী সদর
২৩৫. মানছুরা,নরসিংদী সদর
২৩৬. আসাদুজ্জামান, নরসিংদী সদর
২৩৭. আলমগীর হোসইন, নরসিংদী সদর
২৩৮. জোবায়ের আহমদ, নরসিংদী সদর
২৩৯. আবু সাঈদ, রায়পুরা, নরসিংদী
২৪০. বেলাল হোসেন, দাউদকান্দি, কুমিল্লা
২৪১. হিফজুর রহমান, সেনবাগ, নোয়াখালী
২৪২. সিরাজুল ইসলাম, নরসিংদী সদর
২৪৫. আকুল কাসেম, জামিল মাদরাসা, বগুড়া।
২৪৬. কাজী আব্দুলাহ, বি-বাড়িয়া সদর।
২৪৭. শামসুদ্দুহা সিফাত, বি-বাড়িয়া সদর।
২৪৮. হিজবুল্লাহ আফফান, শিবপুর, নরসিংদী।

৩১৫. আলী হোসেন, আলোকবালি, নরসিংদী।
৩১৬. মূসা খান, ভৈরববাজার, কিশোরগনজ
৩১৭. শরীফা খানম সরাইল, বি, বাড়িয়া
৩১৮. আবু তুরাব, বি, বাড়িয়া সদর
৩১৯. জহিরুল ইসলাম বৌয়াকুড়, নরসিংদী
৩২০. মাঈন, নরসিংদী সদর
৩২১. মায়মুনা নিশাদ মুনা, নরসিংদী সদর
৩২২. কারণ মিয়া, বাঞ্ছারামপুর, বি, বাড়িয়া
৩২৩. শহীদুল ইসলাম, কাপাসিয়া, গাজীপুর
৩২৪. তুহিন আহমদ হৃদয়, আলোকবালি, নরসিংদী।
৩২৫. জুলহাস হাজী, আলোকবালি, নরসিংদী।
৩২৬. আরিফা আক্তার, শেকের চর, নরসিংদী।
৩২৭. রেজাউল করীম শেকের চর, নরসিংদী
৩২৮. শাহেদা খাতুন, বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়া।
৩২৯. সাকিব বিন এবাদুল্লাহ, শিবপুর, নরসিংদী।
৩৩০. মাসউদুর রহমান,মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা
৩৩১. তাসলিমা খাতুন, শিবপুর, নরসিংদী।
৩৩২. ফাতেমা আক্তার, রায়পুরা, নরসিংদী
৩৩৩. নাঈমা আক্তার শিবপুর, নরসিংদী
৩৩৪. মুহাম্মদুল্লাহ, বটতলী, নরসিংদী
৩৩৫. সালাহ উদ্দীন, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
৩৩৬. সাবহাতুল মারজান বুশরা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
৩৩৭. সোহান খন্দকার, ভাগদী, নরসিংদী
৩৩৮. মাসউদা আখতার, ভাগদী ,নরসিংদী
৩৩৯. মনিরা,রায়পুরা, নরসিংদী
৩৪০. মুবাশশিরা, রায়পুরা নরসিংদী
৩৪১. সাখাওয়াত হোসেন রায়পুরা নরসিংদী
৩৪২. মাসুম বিল্লাহ, বেলাব, নরসিংদী
৩৪৩. ফাহিম আহম, আলোকবালি, নরসিংদী
৩৪৪. আশিকুল্লাহ, কান্দিপাড়া বি, বাড়িয়া
৩৪৫. রিয়াজুল ইসলাম, রায়পুরা, নরসিংদী
৩৪৬. শফীকুল ইসলাম, রায়পুরা, নরসিংদী
৩৪৭. ইভানা আখতার, রায়পুরা, নরসিংদী
৩৪৮. শফী উদ্দীন বিন বাহা উদ্দীন, রায়পুরা, নরসিংদী।
৩৪৯. শাফায়াত হোসেন, লাকসাম ,কুমিল্লা
৩৫০. ফামেমা আখতার পারভীন, ছাতক, সুনামগনজ।
৩৫১. শরীফ হোসাইন পাচঁদোনা , নরসিংদী
৩৫২. হানিফ, লাকসাম, কুমিল্লা
৩৫৩. মনজুরুল ইসলাম, দাউদ কান্দি, কুমিল্লা।
৩৫৪. আশেকুল্লাহ, কমলপুর মাদরাসা, ভৈরব,কিশোরগনজ
৩৫৫. নাজমুল হক,কমলপুর মাদরাসা, ভৈরব,কিশোরগনজ
৩৫৬. মাহমুদা আক্তার,ভৈরব বাজার, কিশোরগনজ।
৩৫৭. রিফাত আহমেদ, আলোকবালি, নরসিংদী।
৩৫৮. মুহাম্মদ আলী আড়াই হাজার, নারায়নগনজ।
৩৫৯. উম্মে হাবীবা হিরা, শিবালয়, মানিকগনজ।
৩৬০. সাইফুল্লাহ, লাকসাম, কুমিল্লা
৩৬১. নেয়ামত উল্লাহ, লাকসাম, কুমিল্লা
৩৬২. সাকিবুল হক, আলোকবালি,নরসিংদী
৩৬৩. অলি উল্লাহ, লাকসাম, কুমিল্লা
৩৬৪. আবু তাহের, বেলাব, নরসিংদী
৩৬৫. লোবানা বিনতে তাসলিমা, শিবপুর, নরসিংদী।
৩৬৬. ফারজানা আক্তার, টঙ্গীপাড়া, গোপালগনজ।
৩৬৭. আবুল কাসেম, দূর্গাপুর , নেত্রকোনা
৩৬৮. বিলাল হোসেন, বেলাব, নরসিংদী
৩৬৯. শিবলী, সুনামগনজ সদর
৩৭০. বেলাল হোসেন,ফতুল্লা, নারায়ণগনজ
৩৭১. বিনিয়ামিন, মাহমুদ নগর, ঢাকা
৩৭২. মাওলানা মুঈনুদ্দীন,সুনামগনজ সদর
৩৭৩. জুবায়ের আহমদ, রায়পুরা, নরসিংদী
৩৭৪. আতাউল্লাহ তোফায়েল, ফতুল্লা, নারায়ণগনজ।
৩৭৫. রুবিনা আক্তার, নরসিংদী সদর
৩৭৬. আব্দুল্লাহ নরসিংদী সদর
৩৭৭. মনির হোসাইন, আলোকবালি, নরসিংদী।

৩৭৮. আব্দুল মুমিন, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
৩৭৯. গোলাম ছাদেক,নরসিংদী সদর
৩৮০. হাবীবুর রহমান, সুনামগনজ সদর
৩৮১. তৈয়ুবুর রহমান, আলোকবালি, নরসিংদী।
৩৮২. শাহজালাল, আলোকবালি, নরসিংদী
৩৮৩. আওলাদ হোসাইন, শিবপুর, নরসিংদী।
৩৮৪. সৈয়দা দিলরুবা আখতার, বি-বাড়িয়া সদর।
৩৮৫. আয়েশা আখতার, শিবপুর, নরসিংদী
৩৮৬. শামীম, শিবপুর, নরসিংদী।
৩৮৭. আবু হানিফা শেকের চর, নরসিংদী।
৩৮৮. মাহমুদা, বালসাইর, নরসিংদী।
৩৮৯. আসমা আক্তার, শিবপুর, নরসিংদী
৩৯০. রাফিউল হক, রায়পুরা, নরসিংদী।
৩৯১. সাদ্দাম হোসাইন, ভরতের কান্দি, নরসিংদী।
৩৯২. এহসানুল হক নাসির নগর, বি-বাড়িয়া।
৩৯৩. ফায়সাল, নরসিংদী সদর
৩৯৪. সাবিনা ইয়াছমিন, আলোকবালি, নরসিংদী।
৩৯৫. সাকিবুল ইসলাম, আলোকবালি, নরসিংদী।
৩৯৬. হাসিনা আক্তার, রায়পুরা, নরসিংদী
৩৯৭. জাকির হোসাইন বেলাব, নরসিংদী
৩৯৮. আমিনা আক্তার, কারারচর মহিলা মাদরাসা।
৩৯৯. আমিনুল ইসলাম, বৌয়াকুড়, নরসিংদী।
৪০০. ওমর ফারুক, বৌয়াকুড়, নরসিংদী
৪০১. যায়েদ হাসান,বৌয়াকুড়, নরসিংদী
৪০২. আরজুনা বেগম, নবীনগর, বি-বাড়িয়া।
৪০৩. নাসির আহমদ, খতমে নবুয়ত মাদরাসা, বি, বাড়িয়া।
৪০৪. মোস্তাকিম, শ্যামপুর, ঢাকা
৪০৫. এরশাদুল ইসলাম, ভাদুঘর, বি-বাড়িয়া।
৪০৬. ফজলুল কবীর মাইজদী নোয়াখালী
৪০৭. মঈন উদ্দীন, নাঙ্গল কোট, কুমিল্লা
৪০৮. ফয়সাল আহমদ, মাহমুদ নগর, ঢাকা
৪০৯. রহমত উল্লাহ, বিয়াল্লিশ্বর, বি, বাড়িয়া
৪১০. আল আমিন, দেওভোগ মাদরাসা
৪১১. ইবরাহীম খলীল, সেনবাগ, নোয়াখালী।
৪১২. মুস্তাফিজুর রহমান ভাদুঘর, বি, বাড়িয়া।
৪১৩. সোহেল, কান্দিপাড়া, বি, বাড়িয়া
৪১৪. ফারুক হোসেন, সুহিল পুর বি-বাড়িয়া।
৪১৫. সাইফুল ইসলাম, পরশুরাম, ফেনী
৪১৬. মানসুরা আখতার বীরপুর, নরসিংদী সদর।
৪১৭. ইবরাহীম, নরসিংদী সদর।
৪১৮. সাবিনা ইয়াসমিন, আলোক বালি, নরসিংদী সদর।
৪১৯. মাহমুদুল হাসান শিবপুর, নরসিংদী
৪২০. হিফজুর রহমান, বৌয়াকূড়, নরসিংদী
৪২১. ওমামা আখতার, নরসিংদী সদর।
৪২২. রুজিনাআক্তার, আলোকবালী, নরসিংদী
৪২৩. সুমাইয়া আক্তার, পাচঁদোনা, নরসিংদী
৪২৪. সাহিদা আখতার,শিবপুর, নরসিংদী।
৪২৫. তৈয়্যবা, বটতলী, নরসিংদী।
৪২৬. জাহিদুল হক ঘোড়াশাল, নরসিংদী।
৪২৭. ফারজানা আখতার বালুসাইর, নরসিংদী।
৪২৮. লতিফা আক্তার, আলোকবালি, নরসিংদী।
৪২৯. মেহেদী হাসান রায়পুরা, নরসিংদী
৪৩০. রিনা আক্তার, শিবপুর, নরসিংদী
৪৩১. কামরুন নাহার, করিমপুর, নরসিংদী
৪৩২. সিফাতুল্লাহ বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়া
৪৩৩. জুবায়ের আহমদ, বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়া।
৪৩৪. আমাতুল্লাহ, সরাইল, বি-বাড়িয়া।
৪৩৫. মাহফুজা আখতার, শিবপুর, নরসিংদী।
৪৩৬. এনায়েতুল্লাহ, শিবপুর, নরসিংদী।
৪৩৭. আতাউল্লাহ, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
৪৩৮. আব্দুল্লাহ শেরপুরী, লালবাগ মাদরাসা, ঢাকা।
৪৩৯. আফরোজা আখতার, পাঁচদোনা, নরসিংদী।
৪৪০. ইকবাল হোসাইন, মিরপুর, ঢাকা।
৪৪১. মারিয়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

৫৫৩. হোসাইন আহমদ , শিবপুর, নরসিংদী
৫৫৪. তানজিনা আখতার, শিবপুর, নরসিংদী।
৫৫৫. বেলী আখতার, রায়পুরা, নরসিংদী
৫৫৬. আবুল কাসেম, শ্যামপুর , ঢাকা
৫৫৭. ইয়ামিন, শ্রী নগর , মুন্সিগনজ
৫৫৮. আব্দুর রহমান, লালবাগ মাদরাসা
৫৫৯. সুলতানা, সিরাজদী খান, মুন্সিগনজ
৫৬০. রেজাউল করীম, সরাইল বি, বাড়িয়া
৫৬১. আফিফা আখতার, সরাইল বি, বাড়িয়া।
৫৬২. মাহমুদা আখতার, নবীনগর বি-বাড়িয়া।
৫৬৩. সালমা আখতার, বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়া।
৫৬৪. নাজমা আখতার, সরাইল বি-বাড়িয়া
৫৬৫. খাদীজা আখতার, শিবপুর, নরসিংদী
৫৬৬. এইচ, এম, জাবেদ হোসাইন সুজন, কসবা, বি, বাড়িয়া।
৫৬৭. শামছুদ্দীন, বি, বাড়িয়া।
৫৬৮. বাদল হোসাইন, নবীনগর, বি, বাড়িয়া।
৫৬৯. হাফেজ উবাইদুল্লাহ সরাইল, বি-বাড়িয়া।
৫৭০. আব্দুল আজীজ, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
৫৭১. উম্মে সালমা,সরাইল,বি,বাড়িয়া
৫৭২. বেনু আক্তার,আলোকবালি,নরসিংদী
৫৭৩. কাউছার আহমদ,দওপাড়া নরসিংদী
৫৭৪. নাছির উদ্দীন, বৌয়াকুড় মাদরাসা, নরসিংদী।
৫৭৫. মস্তুফা মিয়া,আলোকবালী,নরসিংদী
৫৭৬. কমলা আক্তার,আলোকবালি,নরসিংদী
৫৭৭. উম্মে হাবীবা,মাধবদী,নরসিংদী
৫৭৮. আব্দুল আজিজ,দওপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
৫৭৯. সায়মা হক সিদ্দিকা, পাচদোনা, নরসিংদী।
৫৮০. শহিদুল্লা,রায়পুরা,নরসিংদী
৫৮১.মোস্তফা কামাল,শিবপুর,নরসিংদী
৫৮২. মোশারফ হুসেন,লালবাগ মাদরাসা, ঢাকা।
৫৮৩. হাফেজ সৈয়দ নাছির উদ্দিন, ইসলামপুর, বি-বাড়িয়া।
৫৮৪. মুহাম্মাদুল্লাহ, রায়পুরা, নরসিংদী।
৫৮৫. ওবাইদুল্লাহ, রায়পুরা, নরসিংয়দী।
৫৮৬. সাইদুজ্জামান, মতিঝিল, ঢাকা।
৫৮৭. আশরাফুল ইসলাম, উলচা পাড়া, বি-বাড়িয়া।
৫৮৮. মামুনুর রশিদ,লালবাগ মাদরাসা,ঢাকা
৫৮৯. মাসুমা আক্তার, বান্ছারামপুর, বি-বাড়িয়া।
৫৯০. হাফেজ মোবারক,সরাইল,বি বাড়িয়া
৫৯১. আব্দুর রহমান,নবী নগর বিবাড়িয়া
৫৯২. সাদেকুর রহমান,কোতয়ালী,বরিশাল
৫৯৩. মাহমুদা জামাল, শ্রীনগর , মুন্সিগনজ
৫৯৪. নাসরিন সুলতানা, পূর্বধলা, নেত্রকোনা।
৫৯৫. মুরসালিন, গজারিয়া , মুন্সিগনজ
৫৯৬. আব্দুর রাহীম , ফুলপুর , মোমেনশাহী
৫৯৭. শাহজাহান খান, নবীনগর বি, বাড়িয়া
৫৯৮. সালমা খানম, নবীনগর বি, বাড়িয়া
৫৯৯. সাইমুন খান, নবীনগর বি, বাড়িয়া
৬০০. ইমদাদুল হক, করিমগনজ, কিশোর গনজ।
৬০১. হোসাইন আহমদ ভান্ডসী, নবীনগর বি-বাড়িয়া।
৬০২. সাবিকুন্নাহার, করিমগনজ, কিশোরগনজ।
৬০৩. কাদের মাহমুদ, দেলদোয়ার , টাঙ্গইল
৬০৪. মোস্তফা কামাল, করিমগনজ, কিশোরগনজ।
৬০৫. ফারজানা আক্তার আঁখি, করিমগনজ, কিশোরগনজ।
৬০৬. জুনায়েদ আহমদ, করিমগনজ, কিশোরগনজ।
৬০৭. সানাউল্লাহ, করিমগনজ, কিশোরগঞ্জ
৬০৮. তামীম আজহার, করিমগনজ, কিশোরগঞ্জ।
৬০৯. ওয়ালীউল্লাহ বিন শফীউল্লাহ, গোপালপুর, টাঙ্গাইল।
৬১০. মোজাম্মেল হোসাইন, শ্যামপুর, ঢাকা
৬১১. ইবরাহীম সুমন, দাউদকান্দি, কুমিল্লা
৬১২. আবু তালহা, মাদানীনগর মাদরাসা, ঢাকা।
৬১৩. এনামুল হক, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী
৬১৪. জামাল উদ্দীন, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
৬১৫. উম্মে সানী , রায়পুরা, নরসিংদী

৮০৫. তামান্না আখতার মীম, হোমনা, কুমিল্লা।
৮০৬. আব্দুস সালাম, বেলাব, নরসিংদী
৮০৭. কাউসার আহমদ, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ
৮০৮. ফজর আলী, আলোকবালি, নরসিংদী
৮০৯. দেলোয়ার হোসাইন, ভেলুয়ারচর, নরসিংদী।
৮১০. সাইফুল্লাহ, হামটি, নরসিংদী
৮১১. জাবের আহমদ, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
৮১২. সিরাজুল ইসলাম, বালুসাইর, নরসিংদী।
৮১৩. এহসানুল হক হাসান, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
৮১৪. আমজাদ হোসাইন, রায়পুরা, নরসিংদী।
৮১৫. মনু মিয়া, আলোকবালি, নরসিংদী
৮১৬. জাকারিয়া, দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
৮১৭. জসিম উদ্দিন, রায়পুরা, নরসিংদী।
৮১৮. খাদিজা আখতার, বালুসাইর, নরসিংদী।
৮১৯. মনিরা আখতার, শিবপুর, নরসিংদী
৮২০. ফারুক আহমদ, নীলক্ষা, নরসিংদী
৮২১. আয়েশা আখতার, বীরপুর, নরসিংদী
৮২২. রুবেল, ঘোড়াশাল, নরসিংদী
৮২৩. গোলাম রাজ্জাক, ভাগদী, নরসিংদী
৮২৪. কারিমা আখতার, মহিষাশুরা, নরসিংদী।
৮২৫. মুস্তাইন বিল্লাহ, দোহাকুনা, যশোর
৮২৬. সাইদুল ইসলাম, দোহার, ঢাকা
৮২৭. হাফেজ আব্দুল কাইয়ুম, ফরিদা বাদ, ঢাকা।
৮২৮. মোস্তফা কামাল, বৌয়াকুড় মাদরাসা, নরসিংদী।
৮২৯. ওমর ফারুক,সাইন বোড মাদরাসা, ঢাকা।
৮৩০. মিযানুর রহমান,বালু সাইর, নরসিংদী
৮৩১. ছাবের আহমেদ, ছাতিয়াইন, মাধবপুর, হবিগনজ।
৮৩২. রেজাউল করিম, সেকের চর, নরসিংদী।
৮৩৩. নাছির উদ্দিন, হাজিপুর, নরসিংদী
৮৩৪. এজহারুল ইসলাম,সাইন বোড মাদরাসা, ঢাকা।
৮৩৫. আবুল কালাম আজাদ, ভাদুঘর মাদরাসা, বি-বাড়িয়া।
৮৩৬. রোম্মানা আখতার, রায়পুরা, নরসিংদী
৮৩৭. জিকরা আক্তার, বটতলী বাজার, নরসিংদী
৮৩৮. আতিকা আক্তার, ইসলাম পুর, নরসিংদী।
৮৩৯. সাকিনা সুলতানা, ইসলাম পুর, নরসিংদী।
৮৪০.কামরুন্নেছা আক্তার,ভাগদী,নরসিংদী
৮৪১. মুস্তাক আহমেদ, জামিল মাদরাসা, বগুড়া।
৮৪২. শ্যমলী আখতার,চিনিশপুর,নরসিংদী
৮৪৩. তানিয়া আক্তার,বাতা কান্দি,নরসিংদী
৮৪৪. শাহিনুর আক্তার,রায়পুরা,নরসিংদী
৮৪৫. নাছিমা আক্তার, করিপুর বাজার, নরসিংদী।
৮৪৬. আলম মিয়া, নজরপুর, নরসিংদী
৮৪৭. মাসুদাআক্তার, নজরপুর, নরসিংদী
৮৪৮. জেসমিন আক্তার, আদিত মারি, লালমনিরহাট।
৮৪৯. সাহিদা আক্তার, রায়পুরা , নরসিংদী
৮৫০. কামালুদ্দীন, দেওভোগ মাদরাসা, নারায়নগনজ
৮৫১. মঈনুল ইসলাম, দেওভোগ মাদরাসা, নারায়নগঞ্জ।
৮৫২. হাবিবা আক্তার, দওপাড়া মহিলা মাদরাসা, নরসিংদী।
৮৫৩. আব্দুল কাদের, বৌয়াকুড় মাদরাসা, নরসিংদী।
৮৫৪. জান্নাতুল ফেরদৌস, হাজীপুর, নরসিংদী।
৮৫৫. সাইদুজ্জামান, নরসিংদী,সদর
৮৫৬. শাহেদ হাসান কামরুল, আটপাড়া, নেএকোনা।
৮৫৭. ছানোয়ার হুসেন ছানা চেয়ারম্যন, সরিষা বাড়ি, জামালপুর
৮৫৮. সুজাউদদৌলা বিন শওকত, জামিল মাদরাসা, বগুড়া
৮৫৯. মুজিবুর রহমান মামুন, সোনাইমুড়ি, নোয়া খালী।
৮৬০. মারুফ হাছান, সাবগ্রাম, বগুড়া
৮৬১. মাসুদুজ্জামান, আরাম বাগ, মতিঝিল, ঢাকা।
৮৬২. নাজমুল ইসলাম, দড়াটানা মাদরাসা, যশোর।
৮৬৩. আমিরুল ইসলাম, আদিতমারি, লালমনিরহাট।
৮৬৪. বাকী বিল্লাহ, তাকমিল, বৌয়াকুড় মাদরাসা, নরসিংদী।

৮৬৫. রাহিমা আক্তার, আলোকবালী, নরসিংদী।
৮৬৬. আতিকুর রহমান,বৌয়াকুড় মাদ্রাসা মার্কেট, নরসিংদী
৮৬৭. সামিয়া আক্তার বীথি, নরসিংদী
৮৬৮. শাহাদাত হুসাইন, রায়পুরা, নরসিংদী
৮৬৯. মাহমুদা আক্তার, আলগী বাজার, নরসিংদী।
৮৭০. হাফেজ আবদাল হুসাইন, নবীনগর, বি-বাড়িয়া
৮৭১. হাফেজ ইলিয়াছ হুছাইন, আদিতমারি, লালমনিরহাট
৮৭২. রুস্তম আলী , জামিল মাদ্রাসা, বগুড়া
৮৭৩. শরীফ হাছান, কতোয়ালী, যশোর
৮৭৪. আব্দুর রহীম, নোয়াখালী সদর
৮৭৫. জান্নাতুল ফেরদৌস, ফুলছড়ি, গাইবান্দা
৮৭৬. মুর্শিদা আক্তার, মির্যানগর, নরসিংদী
৮৭৭. রাশেদুল ইসলাম, নরসিংদী সদর
৮৭৮. শাম্মী সরকার, নরসিংদী সদর
৮৭৯. সাদ্দাম হোসেন, নজরপুর, নরসিংদী
৮৮০. রাকীবুল ইসলাম, বৌয়াকুড় মাদরাসা, নরসিংদী
৮৮১. রোকাইয়া আক্তার,শিবপুর , নরসিংদী
৮৮২. হারুনুর রশিদ, দওপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী
৮৮৩. আলমগীর হুসেন, লালমোহন , ভোলা
৮৮৪. ইব্রাহিম বটতলী, বৌয়াকুড় মাদরাসা, নরসিংদী।
৮৮৫. হেলাল উদ্দিন,পোড়াদহ, কুষ্টিয়া
৮৮৬. জাহাঙ্গীর হুসেন, শিবপুর, নরসিংদী
৮৮৭. মোখলেছুর রহমান, এমদাদিয়া কুতুবখানা, যশোর
৮৮৮. সিরাজুল ইসলাম, দারুল মাআরিফ, যশোর
৮৮৯. হাফেজ নাজিমুদ্দিন, বটতলী বাজার, নরসিংদী
৮৯০. রাবেয়া শিকদার,বটতলী বাজার, নরসিংদী
৮৯১. হাফেজ আব্দুল্লাহ আল মুমিন, সাইনবোর্ড, ঢাকা
৮৯২. তাসলিমা আখতার, কারারচর মহিলা মাদরাসা, নরসিংদী
৮৯৩. রোশিয়া বেগম নীলক্ষা, নরসিংদী
৮৯৪. মিজানুর রহমান, সায়দাবাদ, নরসিংদী
৮৯৫. ইবরাহীম মোল্লা, নরসিংদী সরকারী কলেজ
৮৯৬. শাখাওয়াত হোসেন, কুন্দার পাড়া নরসিংদী
৮৯৭. তানজিনা আখতার, মির্জানগর, নরসিংদী
৮৯৮. শিলা আখতার, টঙ্গী, গাজীপুর
৮৯৯. উম্মে সালমা, চরকাশিম নগর, নরসিংদী
৯০০. তাকরীম, করিমগনজ, নরসিংদী
৯০১. ইমদাদুল হক, চৌধুরী পাড়া মাদরাসা, ঢাকা
৯০২. হুমায়ূন কবির, গুলশান, বাড্ডা, ঢাকা
৯০৩. যাকারিয়া ইদ্রিস, ডি,আই,টি রোড, ঢাকা
৯০৪. জুবাইদা, আদিয়াবাদ, নরসিংদী
৯০৫. সাবীল, বটতলী, নরসিংদী
৯০৬. হাবীবুল্লাহ সিরাজী, টঙ্গী, গাজীপুর
৯০৭. গোলাম রব্বানী, আটপাড়া, নেত্রকোণা
৯০৮. হাফেজ মাসুম বিল্লাহ, টঙ্গী, গাজীপুর
৯০৯. আব্দুল জলীল, টঙ্গী, গাজীপুর
৯১০. গোলাম কিবরিয়া, খালিশপুর, খুলনা
৯১১. তাওহীদুল ইসলাম, টঙ্গী, গাজীপুর
৯১২. আমীর মাষ্টার, নরসিংদী সদর
৯১৩. ছাম্মী ইসলাম সুমাইয়া, নরসিংদী সদর
৯১৪. আতিকুর রহমান, কামরাঙ্গীচর, ঢাকা
৯১৫. তাসলিমা আখতার, বাঞ্ছারামপুর, বি, বাড়িয়া।
৯১৬. এইচ,এম, আমিনুল ইসলাম ফাহিম,মালিহাতা , বি, বাড়িয়া

৯১৭. আকতার হোসেন রিফাত, নরসিংদী সদর
৯১৮. ইয়াসিন খান, বৌয়াকুড় মাদরাসা, নরসিংদী
৯১৯.হাবীবুল্লাহ, বৌয়াকুড় মাদরাসা, নরসিংদী
৯২০. ওয়াসী, চিনিশপুর, নরসিংদী
৯২১. উম্মে হাবীবা, রিয়াজুল জান্নাহ মহিলা মাদরাসা, নরসিংদী
৯২২. নাহিদা, শ্রীনিধি, নরসিংদী
৯২৩. তাহমিনা আখতার ইতি, নরসিংদী সদর
৯২৪. সোহেল আমিন, বালুসাইর, নরসিংদী
৯২৫. ওমর ফারুক, নযর পুর, নরসিংদী
৯২৬. কাজলী আখতার, শিবপুর, নরসিংদী
৯২৭. মোবারক হোসেন, নজরপুর, নরসিংদী
৯২৮. মাহফুজা আখতার, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা
৯২৯. সুলাইমান, ভরতের কান্দি মাদরাসা, নরসিংদী
৯৩০. উম্মে সালমা, কারারচর মহিলা মাদরাসা, নরসিংদী
৯৩১. জুয়েনা, বেলাব,নরসিংদী
৯৩২. আবু সালাবা, আশরাফিয়া মাদরাসা, নরসিংদী
৯৩৩. মাসূম বিল্লাহ, বৌয়াকুড় মাদরাসা, নরসিংদী
৯৩৪. রাকীব আল মামুন, বৌয়াকুড় মাদরাসা, নরসিংদী
৯৩৫. মাহবুবা রহমান, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা
৯৩৬. হাসান ইউসুফ, গাবতলী মাদরাসা, নরসিংদী
৯৩৭. জোবায়ের আহমদ, হাটহাজারী মাদরাসা, চট্টগ্রাম
৯৩৮. মিজানুর রহমান, সদর দক্ষিণ কুমিল্লা, কুমিল্লা ।

সোনালী বাণী

দুটি ফোঁটা আল্লাহর নিকট যত প্রিয়, অন্য কিছুই তত প্রিয় নয়। এক. ওই অশ্রু ফোঁটা যা আল্লাহর ভয়ে বান্দার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। দুই. ওই রক্ত ফোঁটা যা আল্লাহর রাহে শহীদের শরীর থেকে ঝড়ে পড়ে।

–আল হাদীস

আল্লাহ্প্রেম, আত্মশুদ্ধি ও জীবন গঠনের লক্ষ্যে আমাদের প্রকাশিত সৃজনশীল বইসমূহ

- তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড)
- নূরুল কুলূব (তরজমায়ে কুরআন)
- তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন
- তাফসীরে আমপারা
- তাফসীরে পাঞ্জে সূরা
- আখলাকুন নবী ﷺ
- নবী অবমাননার শরয়ী বিধান
- রাসূলের (ﷺ) গৃহে একদিন
- কেমন ছিলেন রাসূল ﷺ?
- আউলিয়ায়ে কেরামের সিয়াম সাধনা
- রমজানের আধুনিক জরুরি মাসায়েল
- আদর্শ শিক্ষক রাসূল ﷺ
- আদর্শ সন্তান
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইলমে হাদীস
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) স্মারকগ্রন্থ
- আলোকিত জীবনের সন্ধানে [১ম ও ২য় খণ্ড]
- দাওয়াত ও তাবলীগের রূপরেখা
- ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা
- কুরআন আপনাকে কী বলে?
- কুরবানির ইতিহাস ও মাসআলা-মাসায়েল
- কুরআন-হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধি (১ম-৩য় খণ্ড)
- মহিয়সী নারীদের দিনরাত
- ছোটদের প্রিয়নবী ﷺ
- তাকবিয়াতুল ঈমান
- কিয়ামত কবে হবে
- তওবার বিস্ময়কর ঘটনা
- বেহেশতী জেওর বাংলা [১ম-৫ম]
- বেহেশতী জেওর বাংলা [৬ষ্ঠ-১০ম]
- বিশ্ব কবিদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ
- বিপদ কেন ও মুক্তি কোন পথে?
- মাযহাব মানি কেন?
- মাসায়েলে মাইয়্যিত
- মুসলিম রমণী
- রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ ﷺ [১ম ও ২য় খণ্ড]
- শবে বরাত ও শবে কদর : করণীয় বর্জনীয়
- [illegible]ীয়-স্বজনের হক ও [illegible] ইবাদ
- [illegible] মাপকাঠি সাহাবায়ে [illegible]
- আল্লাহ্ তা'আলার ৯৯ নামের অজিফা
- চির অভিশপ্ত ইহুদি সম্প্রদায়
- হাশরের ময়দান

উপন্যাস

- গুমরে মরি একলা ঘরে
- বেলা অবেলার মঞ্চ

www.smfoundationbd.com